দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭০ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ৭ মে ২০১৮
২৩ বৈশাখ - ১৪২৫।।
যুগাব্দ ৫১২০
website : www.eswastika.com

বিচারপতির বরখাস্ত প্রস্তাবে বিপন্ন বিচার ব্যবস্থা

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল..

— রবীন্দ্রনাথ (শিবাজী উৎসব)

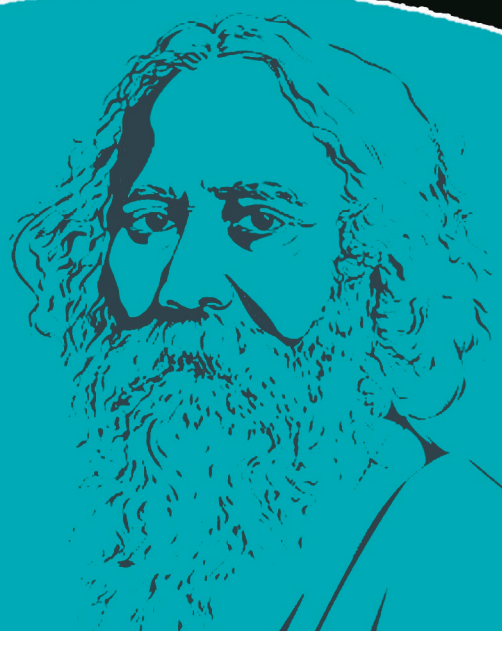

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২৩ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৭ মে - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

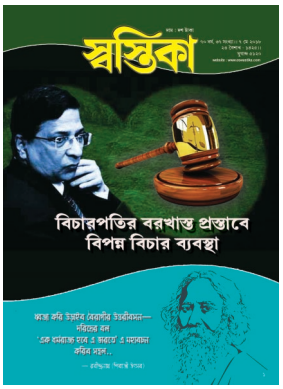

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

তৃণমূলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ভোটবাক্সে ধস নামতে পারে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : আনন্দে নেই আনন্দবাজার ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কর্ণাটকে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি ▯ নীরজা চৌধরী ▯ ৮

মাথা হেট করলে লাঞ্ছনাই প্রাপ্য ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

বিচারপতির বরখাস্ত প্রস্তাবে বিপন্ন বিচারব্যবস্থা ▯ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১৩

ভারতের প্রধান বিচারপতি ও কয়েকটি বিরোধী দল ▯ অশোক কুমার চক্রবর্তী ▯ ১৫

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : পঞ্চায়েত ভোটরঙ্গে মজে লোক রাঢ়বঙ্গে ▯ ১৭

মে দিবসের বিকৃত ভাবনা দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বনাশই করছে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৯

কাঠুয়ার ঘটনা— কিছু প্রশ্ন, কিছু চিন্তা ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৩

ভ্রমণ : দিনাজপুরের শ্রীশ্রীকান্তজীউ এবং সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ▯ ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় ▯ ২৬

সংবাদ জগতের আদিপুরুষ দেবর্ষি নারদ ▯ জহরলাল পাল ▯ ৩১

কোটাসুর ও শিবপাহাড়ি ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩২

সংস্কৃত মহাকাব্য 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' এবং রচয়িতা ভারবি ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

গল্প : হারিয়ে পাওয়া ▯ অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ▯ ৩৫

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' ▯ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ▯ ৪০

সামাজিক সমরসতার নিবিষ্ট সাধক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ▯ অনীত রায় গুপ্ত ▯ ৪৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৪৭-৪৯

সাপ্তাহিক রাশিফল ▯ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ২১** ▯ **অঙ্গনা : ২২** ▯ **এই সময় ও সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০**▯ **খেলা : ৪১** ▯ **অন্যরকম : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভাগাড়ের মাংস, মাংসের ভাগাড়

কলকাতায় সবই বিকোয়। জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে অচল আধুলির মতো উপেক্ষার বিষয়। নয় তো ভাগাড় থেকে গোরু-কুকুর-বিড়ালের মাংস তুলে নিয়ে মানুষকে খাওয়ানো হতো না। সম্প্রতি জানা গেছে, কলকাতার কয়েকটি রেস্টুরেন্টে প্রায় দশবছর ধরে ভাগাড়ের মাংস খাইয়ে জনস্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে নাকি তার কোনো খবরই ছিল না! বিষয়টি জানাজানি হবার পরেও প্রশাসন কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। প্রশ্ন উঠছে, কাদের লুকোতে চাইছে পুলিশ? এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবে স্বস্তিকা। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

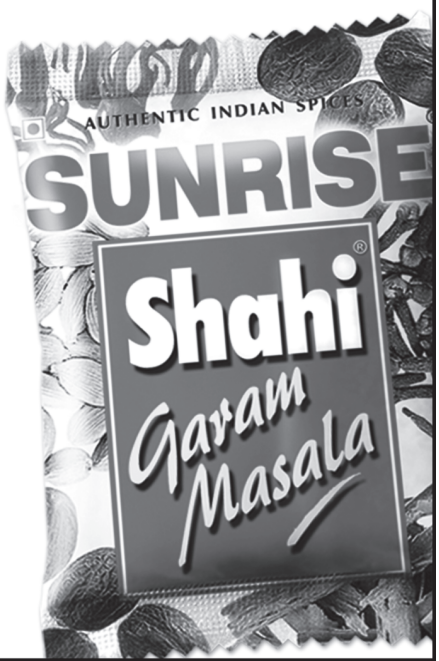

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভোটের নামে প্রহসন

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৩৪.২ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়াছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে এইবার তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টের রেকর্ডও ভাঙিয়া দিয়াছে। এই রাজ্যে বামফ্রন্টের যখন একচ্ছত্র আধিপত্য সেই ২০০৩ সালেও তাহারা এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১১ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়াছিল। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনটি অতিবাহিত হইবার পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ২০ হাজারেরও বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে, ২০০৩ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৬ হাজার ৮০০ আসনে জয়লাভ করিয়াছিল। সেইসময় বিরোধী দল হিসাবে মমতা ব্যানার্জির দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল ঠিকই, কিন্তু সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের সহিত সমান তালে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা তখন তাহাদের ছিল না। তবুও ৯০ শতাংশ আসনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হইয়াছিল। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভ আর এখন ২০ হাজার আসনে অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ অধিক আসনে জয়লাভের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জি দাবি করিয়াছেন, ৪০ শতাংশেরও বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের ক্ষমতা রাখে তাঁহার দল। তৃণমূলের মহাসচিবের এই দাবির সত্যতা লইয়া কোনও প্রশ্ন নাই। কিন্তু প্রথম হইতেই যদি এইরকম একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যে বিরোধী দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্রই জমা দিতে পারিবে না এবং জমা দিলেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে তাহাদের বাধ্য করা হইবে, তবে গণতন্ত্রের সম্বন্ধেই তো একটা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হইবে। এইরকম পরিবেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের তো কোনও অর্থ হয় না।

দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট হইয়াছিল পাঁচ দফায়। এইবার প্রথমে বিজ্ঞপ্তি জারি হইয়াছিল ভোট হইবে তিন দফায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সংশোধিত সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছে ভোট গ্রহণ হইবে এক দফায়। তিন দিনের ভোট একদিনে করিলে কীভাবে বুথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিরোধী দলগুলি সেই প্রশ্ন তুলিয়াছেও। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বক্তব্য, ২০ হাজার আসনে ভোট না হওয়ার কারণে ওই সংখ্যক বুথে নিরাপত্তার জন্য কোনও পুলিশ প্রয়োজন হইবে না। ইহা ছাড়াও রাজ্য সরকার ভিন্ন রাজ্য হইতে পুলিশ আনিবে। যদিও রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত এই নিরাপত্তা পরিকল্পনায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই রাজ্য নির্বাচন কমিশন। অতি-স্পর্শকাতর, স্পর্শকাতর এবং সাধারণ—এই বৈশিষ্ট্যে বুথ বাছাই করিয়া নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করিতে চাহিতেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। তাই এই রাজ্যে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন সম্ভব কিনা—এই প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। অবস্থা যেদিকে গড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় বাকি আসনগুলির অধিকাংশই নির্বাচনের পর শাসক দলের কবজায় চলিয়া যাইতে পারে। ইহাকে তাই ভোটের নামে প্রহসন ছাড়া আর কী বলা যাইবে?

সুভাষিতম্

ইন্দ্রিয়ানি তু সংযমা বকবৎ পণ্ডিতো নরঃ।

কার্য্যকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।। (চাণক্য নীতি)

বক যেমন স্থির চিত্তে কার্যসাধন করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকল সংযত করে স্থির বুদ্ধিতে সমস্ত কার্যসাধন করবে।

তৃণমূলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ভোট বাক্সে ধস নামতে পারে

এখন একটা কথা সকলের মুখে শুনছি। পঞ্চায়েতের নির্বাচন এবার কতটা হিংসাত্মক হবে। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়েছেন ভোটের দিন দলের কর্মীদের কাজ করতে না দিলে বা বাধা দিলে বাধবে লড়াই। মরতে হবে। আগামী ১৪ মে এক দিনেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভোট। একদিনে গোটা রাজ্যের সব বুথে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সিভিক পুলিশের ভেক ধরে তৃণমূল কর্মীরা শান্তি রক্ষা করবে। এই কাজে বাধা দিলে ভোটের দিন রক্ত ঝরবে। শাসকদলের কর্মীদের দায়িত্ব আছে মানুষকে উন্নয়নের চেহারাটা বুঝিয়ে দেওয়ার। বীরভূমের বীরপুত্র কেষ্ট মণ্ডল ঘোষণা করেছেন ভোটের দিন বুথের পথে পথে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে গুড় জল নিয়ে। আপত্তি করলে চলবে না। যেমন, উন্নয়নের কাছে মাথা নোয়ালেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কংগ্রেস প্রার্থী তরজিমুন খাতুন। তিনি খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের কাছে আর্জিও জানিয়ে ছিলেন। লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে তৃণমূলের পতাকা গায়ে জড়িয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'ভুল করেছিলাম উন্নয়নকে চিনতে। কংগ্রেস ছেড়ে এবার তাই তৃণমূলেই নাম লেখালাম।' হ্যাঁ, তৃণমূলের উন্নয়নের এমনই দাপট। ভোটের দিন তাই রক্ত না ঝরলেই অবাক হব।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন বিরোধী দলের প্রার্থী এবং সমর্থকদের সুরক্ষার পথ বন্ধ করতেই এক দিনেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বত্র বিরোধী প্রার্থীদের বাড়িতে আক্রমণ চলছে। কোচবিহার জেলার শীতলখুচি

গূঢ়পুরুষের

কলম

থানা এলাকায় ভাউয়ের থানা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিদেশি প্রার্থী শ্যামল বর্মনের বাড়ি ভাঙচুর করে সশস্ত্র তৃণমূলের উন্নয়ন বাহিনী। এই গ্রামেই আরও চারজন বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে সশস্ত্র উন্নয়ন বাহিনী হামলা চায়। তাদের দাবি একটাই। শ্যামলবাবুকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় মানিককুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরভানপুর আসনে বিজেপি মহিলা প্রার্থীর স্বামী খুন হলেন রহস্যজনকভাবে। জানা গেছে যে ভয় দেখিয়ে মহিলা প্রার্থী তৃষ্ণারানি রায়কে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। তাঁর স্বামীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপরেই খবর আসে স্বামী সুজিত রায় আত্মহত্যা করেছেন।

এটাইতো হওয়ার কথা। তৃণমূল নেত্রীতো বলেই দিয়েছেন পঞ্চায়েতের ১০০ শতাংশ আসন তাঁর চাই। রাজ্যে বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করে ভারতে তিনি নজির সৃষ্টি করতে চান। বামফ্রন্ট যখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন বিরোধী প্রার্থীদের স্ত্রীদের কাছে সাদা থান কাপড় পাঠানোর রেওয়াজ চালু করেছিল সিপিএম। সেই প্রথা তৃণমূল চালু রেখেছে। নদীয়ার দিঘলকান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি প্রার্থী দীপা মণ্ডলের বাড়িতে সাদা থান পাঠিয়ে তৃণমূল জানিয়েছে অবিলম্বে তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করলে তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হবে। একদা সিপিএম যে কায়দায় খুনের রাজনীতি করেছে আজ ঠিক সেই পথে তৃণমূল উন্নয়নের রাজনীতি করছে। উন্নয়ন বোমা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই উন্নয়নদের দেখে ভোটের আগেই সারা রাজ্যের কমপক্ষে ২০ হাজার আসন জিতেছে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এটা গণতন্ত্রের জন্য খুবই বিপজ্জনক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গের নাম তালিকার শীর্ষে। এতে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও লজ্জা নেই। উল্টে কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বসেরা বলতে তিনি গদগদ।

'ডিভাইন জাস্টিস' বা ঈশ্বরের বিচার বলে একটা কথা চালু আছে। খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস চালিয়ে সিপিএম ২০০৯-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন জিতেছিল। তার দু'বছরের মধ্যেই বামেরা এই রাজ্যে হিরো থেকে একেবারে জিরো। কারণ, সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পার্টি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেই একই ছবি দেখছি আজ তৃণমূলের রাজত্বে। কেষ্ট মণ্ডলরা দিদির কথা শুনছে না। মানুষ সব দেখছে। সব শুনছে। তাই বলছি। হুমকি, এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও তৃণমূলের ভোটের বাক্সে ধস নামলে অবাক হবেন না। খুন, সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না।■

আনন্দে নেই আনন্দবাজার

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলনেত্রী
নবান্ন, হাওড়া

প্রিয় দিদি,

এই চিঠি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলনেত্রীকে। আপনি যেহেতু রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনে বসেই দল ও রাজ্য চালান তাই দুই দিদিকে একই ঠিকানায় চিঠি লিখলাম।

পঞ্চায়েত ভোটে আপনিই ম্যান অব দ্য ম্যাচ। আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস ম্যান অব দ্য সিরিজ। আর সেটা আবার ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই। আইপিএলে-এই মরশুমে ক্রিস গেইলের রান তোলাকেও হারিয়ে দিলেন আপনার অনুগত ভাই অনুব্রত মণ্ডলরা।

বীরভূমে জেলা পরিষদের ৪২টি আসনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে তৃণমূল। ১৯টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে দখলে এসেছে ১৬টি। ১৬৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪০টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিনিয়ে নিয়েছে তারা।

এ তো গেল একটি জেলার চিত্র। রাজ্যের মোট আসনের হিসেব ধরলে বে-নজির রেকর্ড গড়ল আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস। এক সময়ে বলা হতো বিরোধীদের প্রার্থী দিতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনাম রয়েছে বামেদের। কিন্তু ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন নতুন ইতিহাস তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গে। ৩০ শতাংশের বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেল শাসক দল দিদি, আপনাকে অভিনন্দন।

দেখে নেওয়া যাক হিসেব কী বলছে—
জেলা পরিষদে মোট আসন—৮২৫
ভোটেই আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে—২০৩
পঞ্চায়েতে সমিতিতে মোট আসন—৯২১৭
ভোটের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে—৩০৫৯
গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন—৪৮৬৫০
ভোটের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে—১৬৮১৪

প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরে নির্বাচন কমিশন সূত্রে যে হিসেব পাওয়া গিয়েছে তাতেই প্রমাণ, রেকর্ড গড়েছে আমাদের রাজ্যের গর্ব তৃণমূল কংগ্রেস। তথ্য বলছে, ২০০৩ সালে বামেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছিল ১১ শতাংশ আসনে। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে প্রায় তিন গুণ বেশি আসন ভোটের আগেই দখলে নিল ঘাসফুল বাহিনী। একেই তো বলে পরিবর্তন।

সিপিএম-এর বক্তব্য, এমন যে হবে সেটা জেনেই নাকি তারা আদালতে 'ই-নমিনেশন'-এর দাবি জানিয়েছিল। আর রাজ্য বিজেপি বলছে, তৃণমূল ভয় পেয়েছে বলেই ভয় দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল।

সে তো বিরোধীরা বলবেই। ওরা কখনও শাসকের সাফল্য দেখতে পায় না। সিপিএম, বিজেপির প্রার্থীরা পর্যন্ত তৃণমূলের হয়ে ভোট প্রচার করছে। মৃত দিলদারের বাবা এখন তৃণমূলের পতাকা মোড়া বালিশে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন না, ঘুমোচ্ছেনই সেটা হলফ করে বলতে পারব না। বিজেপি করা ছেলেকে মৃত্যুর পরে তৃণমূল বানিয়ে দিতে বাধ্য হওয়া বাবার ঘুম আসে কিনা সেটা কেষ্টদা বলতে পারবেন। রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে!

এত দিন আপনার এই সব সাফল্যে সায় দিয়ে এসেছে আনন্দবাজার পত্রিকা। আনন্দের সঙ্গে সুখ্যাতি করেছে কন্যাশ্রীরা। বলেছে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গণতন্ত্রের এমন জীবন্ত রূপ তারা কোনও দিন দেখেনি বলে প্রচার করে এসেছে। কিন্তু আর সে দিন নেই। সেই আনন্দবাজারও নাকি এখন লজ্জা পাচ্ছে আপনার বিনা ক্ষয়ে এমন জয় দেখে।

আর তাই আপনি ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন—আনন্দবাজার আর পড়া চলবে না। আনন্দ টিভি দেখা চলবে না। হাত জোড় করে আবেদনের ভঙ্গিতে আপনি হুমকি দিয়েছেন। আপনার ভাইরা তাই আনন্দবাজার মানে বুঝে নিয়েছে আনন্দবাজারের কর্মীদের। তাদের উপরেই মারমুখী। আর আপনি!

এতদিন ধরে যে আনন্দবাজার আপনাকে কাগুজে বাঘ বানিয়েছে বিজেপির ভয়ে তাকেই আপনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন আনন্দবাজারের সামনে নীল-সাদা মঞ্চ বেঁধে বেনামি বিক্ষোভ বসিয়ে দিয়েছেন। সামনের ফুটপাথে হকার বসিয়ে দিয়েছেন। গাড়ি রাখার জায়গায় অটো স্ট্যান্ডের পরিকল্পনা করেছেন। বেশ করেছেন দিদি। ওদের বোঝা উচিত আপনার শক্তি কতটা। চাইলে আপনি কি না করতে পারেন!

দিদি আপনি এগিয়ে চলুন। আর কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আমি জানি—আপনি চাইলে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। করতেই পারেন।

—**সুন্দর মৌলিক**

কর্ণাটকে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি

অতিথি কলম

নীরজা চৌধরী

সুদূর লন্ডনের বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকবাসীর হৃদয়ে পৌঁছবার চেষ্টাও করলেন। বিলেতে গিয়ে সেখানে কর্ণাটকের দ্বাদশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারক বাসবান্নার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি তাঁর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন। কর্ণাটকের শক্তিশালী লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় একই সঙ্গে যেমন বাসবান্নার অনুরাগী তেমনি তারা চিরাচরিতভাবে বিজেপিরও সমর্থক বটে। এই লিঙ্গায়েতরাই ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনে একটা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে।

ধরে নেওয়া হচ্ছে ২০১৮-র বিধানসভার ফলাফল সমগ্র দেশের ২০১৯-এর সংসদীয় নির্বাচনের সুর বেঁধে দেবে। যদিও অতীতে কর্ণাটকবাসী বহুবারই জাতীয় ফলাফলের গতিপ্রকৃতির উল্টো পথে ভোট দেওয়ার নজির রেখেছেন। ২০০৯ সালেই সামগ্রিকভাবে আদবানীর নেতৃত্বে বিজেপি জয় পেতে ব্যর্থ হলেও তখনও কিন্তু কর্ণাটকে দল ১৯টি

> “বিজেপি কর্ণাটককে অনেকটাই দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার বলে ভাবে, তাই কর্ণাটকে জিতে আসতে পারলে দলের প্যান ইন্ডিয়া ভাবমূর্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জয় গোরক্ষপুর ও ফুলপুরের আকস্মিক পরাজয়কেও পেছনে ঠেলে দেবে।”

আসন জিতেছিল যা সংখ্যায় ২০১৪-র বিপুল নরেন্দ্র মোদী ঢেউয়ের ফলাফল থেকে মাত্র ২টি কম। এছাড়া ১৯৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৯ ও ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও সারা দেশের ভোট দেওয়ার প্রবণতা থেকে কর্ণাটক ভিন্ন পছন্দের দলকে ভোট দিয়েছিল।

এখন যখন ২০১৯-এর প্রহর গোনা প্রায় শুরু হয়ে গেছে, সেই অবস্থায় কর্ণাটকের বিধানসভার জয় অথবা পরাজয়ের অভিঘাত ২০১৯-এর জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর মানসিক ভাবনা-স্তরকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। বিজেপি কর্ণাটককে অনেকটাই দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার বলে ভাবে, তাই কর্ণাটকে জিতে আসতে পারলে দলের প্যান ইন্ডিয়া ভাবমূর্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকী এই জয় গোরক্ষপুর ও ফুলপুরের আকস্মিক পরাজয়কেও পেছনে ঠেলে দেবে।

কংগ্রেসের জন্য বাজি কিন্তু অনেক বড়। এখানে জয়ী হলে দলের পুনরুত্থান হচ্ছে এ প্রচার দানা বাঁধতে পারে। একই সঙ্গে ২০১৯ সালে অন্য দলগুলির সঙ্গে দর কষাকষি করার ক্ষেত্রে নিজের অবস্থানও তুলনামূলকভাবে অনেক শক্ত হবে। কংগ্রেসের বহুদলীয় গণতন্ত্র ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে federal structure -এর নিরিখে রাজ্যভিত্তিক প্রভাবশালী নেতৃত্ব তৈরির চেষ্টাও যে অতীতের মতো সফল হতে পারে, ফলাফলের মধ্যে তাও বোঝা যাওয়ার সুযোগ আছে। ৬০-এর দশক অবধি প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার যে জোর এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কর্ণাটকে হারলে কংগ্রেস একটি অকিঞ্চিৎকর দলে পরিণত হবে যারা কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই কোনও মতে টিকে আছে এবং সঙ্গে নাম কা ওয়াস্তে মিজোরাম।

জনতা দল (এস) রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অনেকটা পেছনে থাকলেও তারা ‘রাজা তৈরির’ ক্ষমতাধারী শুধু নয়, ৫০-এর অধিক আসন পেলে দলপতি এইচ ডি কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যেতে পারেন কেননা বিধানসভা তখন ত্রিশঙ্কু তো হবেই। এমন অবস্থা হলে তার একটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল আছে যা অন্যান্য ক্ষেত্রীয় দলগুলির মনোবল অনেক বাড়িয়ে দেবে তা সে ২০১৯ সালে তারা যে মূল দলের সঙ্গেই জোট বাঁধুক না কেন। স্থলপথে গাড়িতে গাড়িতে প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার কর্ণাটকের নানান জনপদে ঘুরে রাজনীতিবিদরা, সাধারণ মানুষ কী বুঝছে, বলছে জানতে গিয়ে অনেক বিস্ময়কর তথ্য উঠে এসেছে।

কংগ্রেসের সিদ্ধারামাইয়া তার Sc/backward/minority জোটকে অনেকটাই অক্ষত রাখতে পেরে কিছুটা শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। দলিত ‘খয়ডিগা’ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলেও সিদ্ধরামাইয়া তা সামলে নেবার চেষ্টা করছেন। তবে তাঁকে বিজেপির দীর্ঘদিনের লিঙ্গায়েত দুর্গে চিড় ধরাতে হবে, যেটা খুব সহজ নয়।

বিজেপির চিরাচরিত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে লড়তে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মভিত্তিক জাতিভেদকে আবার তুলে এনেছেন। লিঙ্গায়েতকে আলাদা ধর্মের দাবি তুলে এর সঙ্গে আলাদা কন্নড় ধ্বজা আর গান জুড়ে দিয়ে তীব্র ভেদাভেদের চটুল রাজনীতি করছেন। রাজ্যে সস্তায় ভরতুকির

নানা সুবিধে বিতরণ করে যিনি গরিবদের মসিহা হওয়ার চেষ্টাতেও কসুর করেননি।

অন্যদিকে ৫ বছর অন্তর পাল্টানোর নির্মীয়মাণ ট্রাডিশন মেনে ২০১৮ বিজেপির পক্ষে নিশ্চিত হওয়ার কথাই ছিল। কিন্তু ২০০৮-এর মতো ২০১৮-তে বিজেপির পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা সেইভাবে ক্লিক করতে হয়তো পারছেন না। ফলে লড়াইটা ঠিক সিদ্ধারামাইয়া বনাম ইয়েদুরাপ্পায় জমছে না। কর্ণাটকবাসী তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন শুরু হবে নরেন্দ্র মোদীর জনসভা। খেয়াল রাখতে হবে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে এসে তিনি ফলাফলের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। বাজি জিতেছিল বিজেপি। ২০১৭ সালের শেষ দিকের কথা।

মোদীর জনপ্রিয়তা ও জনসংযোগ দক্ষতা আজ মিথের পর্যায়ে চলে গেছে। কর্ণাটকেও তাঁর সমর্থক ও শুভচিন্তক বড় কম নেই। কিন্তু অনুবাদ করা বক্তৃতায় (কেননা অনেকেই হিন্দি তেমন বোঝেন না) অনেকটাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর অননুকরণীয় ভঙ্গীর শ্লেষ ও আন্তরিক আবেগের যে বিস্ফোরণ, তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাগুলির ট্রেডমার্ক ও তার সামগ্রিক প্রভাব... অনুবাদে পাওয়া শক্ত। আর একটা বিষয়— কর্ণাটকে সমস্ত দলেরই শক্তপোক্ত প্রাদেশিক নেতাদের বরাবরই দেখা গেছে যেমন কংগ্রেসের নিজলিঙ্গাপ্পা, দেবরাজ আরস্ বীরাপ্পা মইলি, জনতা দলের রামকৃষ্ণ হেগড়ে, এস আর বোম্মাই বা জনতা (এস)-এর দেবেগৌড়া ও তাঁর পুত্র কুমারস্বামী, অন্যদিকে বিজেপির ইয়েদুরাপ্পা বা অনন্ত কুমার— এঁদের সকলেরই রাজ্য স্তরের রাজনীতিতে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল বা আছে। তাই উত্তর প্রদেশ ধাঁচের কোনও মডেল এখানে পুরোপুরি খাপ খাওয়ানোর অসুবিধে থাকতে পারে।

মহীশূর অঞ্চলে দেবেগৌড়ার দলের আধিপত্য এখনও কায়েম রয়েছে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত কংগ্রেস ও জে ডি (এস)-এর মধ্যে। মহীশূরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষজনের সঙ্গে কথোপকথনে জে ডি এস ছাড়া অন্য কারুর সমর্থক প্রায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা অন্ধ ভোকালিঙ্গা সমর্থক অর্থাৎ জে ডি (এস)। তবে এই অঞ্চলে তৃণমূলস্তরে বিজেপি-জেডি (এস)-এর একটা সমন্বয় কিন্তু নজরে পড়েছে। এই কারণেই 'চামুণ্ডেশ্বরী' কেন্দ্র যেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দাঁড়ানোর কথা সেই কেন্দ্রটি হঠাৎ কঠিন হয়ে পড়েছে।

কর্ণাটকে হঠাৎ করে কিছুটা পর্দার আড়ালে চলে যাওয়া 'মণ্ডল রাজনীতি' আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শক্তিশালী জাতি গোষ্ঠীগুলি যেমন জাঠ, পাটিদার বা মারাঠারা চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দাবি করে বসেছিল। রাজ্য সরকারগুলিও তার নিজস্ব বাধ্যবাধকতার জন্য এমন সব দাবি মেনে নিতে বাধ্যও হয়েছে। চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। এই বার কর্ণাটকের পালা, সেখানে শক্তিশালী লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় সংখ্যালঘুর সুবিধে দাবি করছে। মুখমন্ত্রী স্বয়ং তাদের হয়ে সওয়াল করছেন যাতে তারা চাকুরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে পেতে পারে। আর কে না জানে তরুণ বয়সের লিঙ্গায়েতদের কাছে এমন বস্তু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। অবশ্য দাবিটির স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন দরকার।

এই সার্বিক পরিস্থিতিতে সিদ্ধারামাইয়া যদি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পান বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার এমন কাছাকাছি না থাকেন, যেখানে 'মহারাষ্ট্র একীকরণ সমিতি' ও নির্দলদের নিয়েও সরকার গড়া সম্ভব হচ্ছে না তখন খেলাটা কিন্তু ঘুরে যাবে। বিজেপি ও জনতা দল (এস) মিলে মিলিজুলি সরকার গড়বে। এই প্ল্যান বি বিজেপি সভাপতি সম্ভবত তাঁর আস্তিনের তলায় রেখেছেন।

অন্যদিকে কংগ্রেসের অন্য একটি স্বপ্ন রয়েছে। ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে যেহেতু দেবেগৌড়া বা কুমারস্বামী উভয়েরই কংগ্রেসের সিদ্ধারামাইয়ার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা থাকায় সেক্ষেত্রে তারা সিদ্ধারামাইয়ার বদলে অন্য কোনও কংগ্রেস মুখকে মুখ্যমন্ত্রী পদে সমর্থন দিয়ে দিতে পারে। এই সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমিতে আসন্ন কর্ণাটক নির্বাচন কোনও দলকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না। ■

বাঁকা চোখে

প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথন

প্রেমিকা— বাবা বলেছে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

প্রেমিক— দারুণ। তা কবে দেবে?

প্রেমিকা— তার আগে অবশ্য বাবার একটা শর্ত আছে?

প্রেমিক— বল, কী শর্ত? আমি তোমার জন্য সব করতে পারি।

প্রেমিকা— বাবা বলেছে, বীরভূম মনোনয়ন জমা দিয়ে তোমাকে জিতে আসতে হবে।

প্রেমিক— চলি রে বোন। ভালো থাকিস।

ঝন্টুর প্রেমপত্র

সেদিন রাস্তার ঝন্টুর সঙ্গে দেখা। মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে প্লাস্টার। ঠোঁটেমুখে রক্ত। জামা ছেঁড়া। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম— কী রে ঝন্টু? একী অবস্থা তোর? কী হলো?

হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে ঝন্টু বলল— আর বোলো না দাদা। পুঁটিকে প্রেমপত্র দিতে যাচ্ছিলাম। তৃণমূলের ছেলেরা মনোনয়নপত্র ভেবে বেধড়ক কেলিয়েছে।

উবাচ

“যদি বাইরে থেকে পুলিশ আনতে হয়, তাহলে তো কেন্দ্রীয় বাহিনী আনাই ভালো ছিল।”

পঞ্চায়েত নির্বাচনে অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনার প্রসঙ্গে

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তন স্পিকার

“তিনি এখন কংগ্রেসকে চাঙ্গা করার জন্য বলছেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হবে। রাহুল গান্ধী দিবাস্বপ্ন দেখছেন।”

কর্ণাটকে নির্বাচন প্রসঙ্গে

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী

“গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব সরকারের কাছে আমরা জানাব। যদি তারা সাহায্য করে, তবে ভালোই। নাহলে আমরা করবো। শিক্ষা আমাদের কাছে ব্রত, ব্যবসা নয়।”

ভূপালে গুরুকুল শিক্ষা সম্মেলনে

মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আর এস এস

“আমার মা ও বাবার জন্যই এই কৃতিত্ব লাভ করেছি।”

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বসুর রেকর্ড ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে

পবন চামলিং
মুখ্যমন্ত্রী, সিকিম

“ভারতবর্ষে কোনও দিন ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। অন্য দেশ বা ভিন্ন চিন্তাধারার ওপর হামলার ইতিহাস আমাদের নেই। ভগবান বুদ্ধ এখানে বসেই মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন।”

নয়াদিল্লিতে বুদ্ধপূর্ণিমায় বক্তব্যে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মাথা হেঁট করলে লাঞ্ছনাই তো প্রাপ্য

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বেই এবার এই রাজ্য যে হিংসা প্রত্যক্ষ করেছে, সাম্প্রতিক অতীতে দেশের আর কোনও রাজ্যেই কোনও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এমন হিংসা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং, অন্যান্য রাজ্যগুলি যখন নির্বাচনী হিংসার পথ পরিহার করে, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যারা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে অবাধ নির্বাচনী হিংসার পথেই ফিরে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বেই এই রাজ্যের শাসকদল এবার বুঝিয়ে দিয়েছে, সুষ্ঠু-গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তারা আদৌ বিশ্বাসী নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে এবার হিংসার চিত্রটি সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে বিস্তর বাদ-বিসম্বাদ, প্রতিবাদ, লেখালেখিও হয়েছে। কাজেই সে প্রসঙ্গ আর নতুন করে উল্লেখ করছি না। এবার এই সন্ত্রাসের আবহেই আরও একটি ঘটনাও ঘটেছে। তা হলো, সংবাদমাধ্যমের ওপর কুৎসিত আক্রমণ। নির্বাচনী মনোনয়ন পর্বে এবার বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন। শাসক দলের গুণ্ডাদের মারে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন কয়েকজন সাংবাদিক। কোথাও কোথাও সাংবাদিকদের আটকে রেখে মারধর করা হয়েছে। মহিলা সাংবাদিকরাও এই হেনস্তার হাত থেকে রেহাই পাননি। তাদেরও আটকে রেখে নিগ্রহ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন করে সাংবাদিককে তল্লাশি করার ঘটনা ঘটেছে। তিন দশকেরও বেশি সময় সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত আছি। সিপিএমের শাসনকালে এই রাজ্যে সাংবাদিকদের ওপর শাসকদলের ক্যাডারদের নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকী সংবাদসংগ্রহ করতে গিয়ে আমি নিজেও নিগৃহীত হয়েছি। ১৯৯৩ সালে মেটিয়াবুরুজে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই গাড়িতে একটি সভাস্থলে যাওয়ার পথে বন্দর অঞ্চলের সিপিএম আশ্রিত গুণ্ডারা হামলা চালায়। সে হামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতরভাবে আহত হন। আমারও চোখের নীচে, গালে ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তবু বলব, সম্পূর্ণ নগ্ন করে সাংবাদিককে তল্লাশি করার মতো ঘটনা তখনও ঘটেনি। বা, তখন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন ব্যাপক হারে শাসক দলের সন্ত্রাসের মুখেও পড়তে হয়নি। এবারের ঘটনা কিন্তু অতীতকে ছাপিয়ে গেছে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর কোনও দেশেই শাসকের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক কখনই সুমধুর হয় না। একশো শতাংশ স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কোনও শাসকই পছন্দ করে না। সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা সব সময়ই শাসকের না-পসন্দ। পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি— সংবাদমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও,

> “আগে যে সাংবাদিকরা সবাই খুব সৎ ছিলেন, তা বলছি না। কিন্তু তখন মাথা নুইয়ে না দেওয়া সাংবাদিকের তালিকাটি দীর্ঘ ছিল। আর এখন দেখছি, মস্তক বন্ধন রেখে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াদেরই ভিড় সংবাদমাধ্যমে।”

অনেক শাসকই সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলার ঘটনাকে সমর্থন করেন না। আবার অনেক শাসককে দেখেছি এবং দেখছিও, যারা পেশীশক্তির জোরে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতেই আগ্রহী। যেমন--- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমকে বলা হয়ে থাকে, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এই চতুর্থ স্তম্ভটি সত্যকে তুলে ধরে সমাজের সামনে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করাই এই চতুর্থ স্তম্ভটির কাজ। ফলে, এটাই স্বাভাবিক যে এর সঙ্গে শাসকের কোনও দীর্ঘকালীন মধুচন্দ্রিমা চলতে পারে না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে এই রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। এ ঘটনা অতীব দুঃখজনক এবং অবশ্যই নিন্দনীয়। এই সংবাদ কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, কারণ, সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ুক শাসক দল তা কখনই চায়নি। সত্যকে আড়াল করতেই সংবাদমাধ্যমের ওপর এই হামলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন নেত্রী এবং তাঁর মস্তান নির্ভর দল যে এই হিংস্র তাণ্ডব চালাবেই— তা নিয়ে খুব বেশি একটা অবাক হওয়ার বোধহয় অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য তিনি অবশ্যই দায়ী। কিন্তু শুধু তিনি কি একাই দায়ী? কিছুটা হলেও খোদ সংবাদমাধ্যমের মালিক পক্ষ এবং সংবাদ কর্মীরাও কি দায়ী নন? প্রশ্নটা সেখানেই।

বাংলা সংবাদপত্রের অতীতটি কিন্তু এককথায় ঐতিহ্যশালী। রেনেসাঁ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম— এই পুরো সময়কালটিতে বাংলার সংবাদপত্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলার নবজাগরণ এবং বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন— দুই ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই ছিল মূল চালিকা শক্তি। স্বাধীনতার পর সেই সংবাদপত্র অবশ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। তবু বলব, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলেও তার ভিতর কিছুটা

সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল। জরুরি অবস্থার সময়, যুগান্তর-অমৃতবাজারের মতো মার্কামারা কংগ্রেসি সংবাদপত্র বাদে বাংলা থেকে প্রকাশিত আর সব সংবাদপত্র এর বিরোধিতা করেছিল। বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, নিশীথ দে-র মতো সংবাদিকরা কারাবরণ করেছিলেন। সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনকালে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে দেখেছি, দু-একটা কাগজ বাদে আর বাকিসব কাগজই সিপিএমের অপশাসনের বিরোধিতা করেছে। কেউ প্রবলভাবে, কেউ বা মধ্যমভাবে। আসলে, এই সময়টি পর্যন্ত সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ সাংবাদিকের কাছে সংবাদ পরিবেশন করাটাই মুখ্য ছিল। সাংবাদিকতার আড়ালে তারা অন্য কোনও কিছু অন্তত করতে যাননি।

বাংলা সংবাদ জগতে একটি আমূল পরিবর্তন এল ২০১১ সালের পর থেকে। অর্থাৎ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করা গেল— এই রাজ্যের সবকটি সংবাদমাধ্যমই শাসকের বন্দনায় ব্যস্ত। ব্যস্ত শুধু তাই নয়। কে কত বেশি বন্দনা করতে পারেন— তার যেন ধূম পড়ে গেছে। আমার এক বয়ঃকনিষ্ঠ সাংবাদিক কিছুদিন আগে আমাকে মজা করে বলছিলেন— 'আগে খবর লেখার জন্য টাকা পেতাম। এখন খবর চেপে যাওয়ার জন্য টাকা পাই।' কথাটির ভিতর মজা যত না ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল করুণ স্বীকারোক্তি। ওই বয়ঃকনিষ্ঠ সাংবাদিকটি যে কাগজে কর্মরত, সেই সংবাদপত্রের এক মালিক রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সৌজন্যে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকেন। মন্ত্রীর মা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে রাত জেগে পাহারা দেন ওই সংবাদপত্র মালিক। রোজ সন্ধ্যায় ওই মালিকের কাছে নবান্ন থেকে নির্দেশ আসে কোন খবরটা যাবে, আর কোনটা যাবে না। এহেন মালিকের কাগজে এমন দুজন সাংবাদিক কাজ করেন, যাদের বাড়িতে প্রতি মাসে কোনও কোনও মন্ত্রী-বিধায়কের টাকার বাণ্ডিল এবং নানাবিধ উপঢৌকন পৌঁছে যায়। এই দুই সাংবাদিকের ভিতর একজনের বিরুদ্ধে আবার তোলাবাজদের সঙ্গ দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের খাতায় নামও রয়েছে। কলকাতার এক বহুল প্রচরিত সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠী নিউটাউনে জমির বিনিময়ে শাসকের পদলেহন শুরু করেছিলেন। এই সংবাদপত্রে এমন সব সাংবাদিকরা আছেন, যাদের সম্পর্কে টাকার বিনিময়ে দালালি করা এবং রাজনৈতিক নেতাদের থেকে ঘুষ নেওয়ার কাহিনি শোনা যায়। আর একটি সংবাদপত্র, বাম আমলে যারা সিপিএম, বিশেষত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বড় সমর্থক বলে পরিচিত ছিল, তারা এই আমলে জামা পালটে বড়ো তৃণমূলি সেজেছে। এই কাগজের মমতা-ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক বিদেশে গিয়ে রুপোর চামচ চুরি করে বাংলার সাংবাদিককুলের মাথা হেঁট করে দিয়েছেন। এই কাগজের এক উঠতি সংস্কৃতিবান মালিক মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করে রাজারহাটে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য জমি হাতিয়ে নিয়েছেন। এক বিশিষ্ট সাংবাদিক, তিনি এক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পটুয়াপাড়ার অগ্নিকন্যা' বলে উপহাস করেছিলেন, সেই তিনিই সারদা কাণ্ডে দুবার সিবিআই তলব পেয়েই মমতাকে 'মানসকন্যা' বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়ে এখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোরাসে গানও গাইছেন। এর বাইরেও অনেক সাংবাদিক আছেন, যাদের গত সাত বছরে শ্বেতপাথরের প্রাসাদোপম বাড়ি হয়েছে, বেনামে হোটেল হয়েছে, ধনে-মানে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন তাঁরা। আগে যে সাংবাদিকরা সবাই খুব সৎ ছিলেন, তা বলছি না। কিন্তু তখন মাথা নুইয়ে না দেওয়া সাংবাদিকের তালিকাটি দীর্ঘ ছিল। আর এখন দেখছি, মস্তক বন্ধন রেখে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াদেরই ভিড় সংবাদমাধ্যমে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কৌশলে একটি কাজ করতে পেরেছেন। যেটি সিপিএম বা তারও আগে সিদ্ধার্থশংকর রায় করেননি। তা হলো— এমন একটি বৃত্ত তৈরি কর, যে বৃত্তের ভিতর প্রবেশ করলে অর্থ থেকে শুরু করে সব প্রমোদসামগ্রী হাতের মুঠোয়। এবং বৃত্তের বাইরে থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। একথাও অস্বীকার করা যাবে না— গত সাত বছরে এই বৃত্তের বাইরে যাঁরা অবস্থান করতে চেয়েছেন, সেইসব মুষ্টিমেয় সাংবাদিকদের কলম কার্যত অকেজো করে দেওয়া হয়েছে।

শাসকের অনুগৃহীত এবং শাসকের প্রসাদে ফুলে-ফেঁপে ওঠা এই সাংবাদিক এবং মালিকগোষ্ঠীই এখন বাংলা সংবাদমাধ্যমে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। গত সাত বছর ধরে এরাই সত্যকে আড়াল করে গেছেন ক্রমাগত। এরা দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, ইলামবাজার, কালিয়াচকের খবর ছাপেননি, ধূলাগড়ের খবর বিকৃত করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যা ভাষণকেই এরা সত্য বলে প্রচার করে দিয়েছেন। রানিগঞ্জ-আসানসোল নিয়ে মিথ্যা প্রচার করেছেন। প্রতিদিন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। তার বদলে শাসকের ছুঁড়ে দেওয়া এঁটোটা কাঁটাটা পেয়েছেন। আজ যদি একজন সাংবাদিককে নগ্ন করিয়ে তল্লাশি করার স্পর্ধা শাসক দলের মস্তানরা দেখাতে পারে, তার অন্যতম একটি কারণ হলো— সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ তাদের মেরুদণ্ডটি বেচে দিয়ে এসেছে শাসক দলের পদতলে। সংবাদমাধ্যম যদি মাথা উঁচু করে চলার সাহস দেখাতো, সত্যকে আড়াল না করত— তাহলে তাকে চরম লাঞ্ছনা করার সাহসও শাসকের হতো না। যে সাংবাদিক চামচ চুরি করে, যে সাংবাদিকের বাড়িতে মাস শেষে টাকার বান্ডিল পৌঁছয়, যে সাংবাদিক দালালের কাজ করে, যে মালিক মন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় প্রমোদ রাত্রি উদ্‌যাপন করেন— তাদের সম্মান করবে কেন শাসক দল? নগ্ন করে তল্লাশি তো এই তাচ্ছিল্যেরই প্রতীক।

মনে আছে, হুসেন মহম্মদ এরশাদের জমানার অবসানের পর বাংলাদেশে গিয়েছিলাম নির্বাচনী সংবাদ করতে। তখন দেখেছিলাম, ঢাকায় একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকাটির শিরোনাম 'এরশাদের ভাউড়া।' ভাউড়া অর্থে পোষা দালাল। তালিকাটি ঢাকা প্রেস ক্লাবের দেওয়ালেও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই তালিকায় প্রায় জনা পঁচিশ সাংবাদিকের নাম ছিল, যাঁরা এরশাদের থেকে নানারকম অবৈধ সুবিধা নিয়েছিলেন। তালিকাটি প্রকাশের পর ওই সাংবাদিকরা অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বাংলা সংবাদমাধ্যমের তথাকথিত রথী-মহারথীদের দেখে সেই 'এরশাদের ভাউড়া'-র কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে আবার।

বিচারপতির বরখাস্ত প্রস্তাবে বিপন্ন বিচারব্যবস্থা

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনার জন্য কংগ্রেস-সহ কয়েকটা রাজনৈতিক দল উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম কে বেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তা তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। তার জন্য অন্তত ৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণের দরকার। কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের কয়েকজনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, আর অধিকাংশ দলই এই ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখায়নি।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার— এক্ষেত্রে 'ইমপিচমেন্ট' কথাটা আদৌ চলে না। কারণ হলো— শুধু আমাদের রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি প্রসঙ্গেই সংবিধানে 'impeachment' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর কারও ক্ষেত্রে সেটা নেই। ১২৪ (৪) এবং ২১৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদ দুটোতে যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বরখাস্ত করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে 'ইমপিচমেন্ট' শব্দটা আদৌ নেই। তাছাড়া পূর্বোক্ত নেতারা প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্ত করতে চেয়েছেন, কারণ সুপ্রিম কোর্টের চারজন বিচারপতি সম্মিলিতভাবে প্রধান বিচারপতির কিছু কার্যবিধি নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তাতে মামলা-বণ্টন প্রভৃতি প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আছে, বিচার ব্যবস্থার ওপর উপরমহলের চাপ সৃষ্টির অভিযোগও তাতে রয়েছে। এগুলো প্রধান বিচারপতিকে অপসারিত করার মতো ব্যাপার কিনা জানি না। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ছাড়া ২৪ জন বিচারপতি আছেন। কিন্তু চারজন ছাড়া আর কেউ এই সব ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেননি। সুতরাং বলা যায়— সংবিধান অনুসারে এই ক্ষেত্রে ১২৪ (৪) নং অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য কিনা, সেটা শুধু বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন।

আমাদের সংবিধানের ১২৪ (৪) নং অনুচ্ছেদে আছে— রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতিকে বিতাড়িত করেন 'after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two thirds of the members of that House present and voting has been presented to the president...।' অর্থাৎ প্রস্তাবটা সংসদের যে

বেঙ্কাইয়া নাইডু ঠিক করেছেন : সুভাষ কাশ্যপ

সুভাষচন্দ্র কাশ্যপকে সারা দেশ অগ্রগণ্য সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে চেনে। তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রকে বরখাস্ত করার যে প্রস্তাব কংগ্রেস-সহ দেশের সাতটি বিরোধী দল দিয়েছে তা খারিজ করে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু ঠিক করেছেন। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, উপরাষ্ট্রপতির কাছে এই সিদ্ধান্তই প্রত্যাশিত ছিল। তাঁর ভাষায়, 'ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেই ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব। সুনির্দিষ্ট (এবং প্রমাণিত) অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারপতিদের অপসারিত করা যেতে পারে। মিডিয়া এবং এক শ্রেণীর স্বঘোষিত পণ্ডিত ভুলভাল কথা বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন।' উল্লেখ্য, সুভাষ কাশ্যপ দীর্ঘদিন লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রধান বিচারপতির নামে কোনও প্রাইমা ফেসি কেস নেই। তাই কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পূর্ণতই সারবত্তাহীন।' তাঁর মতে দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির আরও দায়িত্ব সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

কোনও কক্ষে তোলা যায়। কিন্তু সেটা কার্যকর করতে হলে উভয় কক্ষেই মোট সদস্যের অর্ধেক এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের অন্তত দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের দরকার। তাছাড়া অভিযোগ হতে হবে (১) অন্যায় ও অশোভন আচরণ, ('misbehaviour') বা অক্ষমতার ('incapacity')। সেটাও হতে হবে প্রমাণিত ('proved')। তাদের ত্রুটি বা অন্যায়টা প্রমাণ করতেই হবে। আর অক্ষমতা হতে পারে শারীরিক বা মানসিক। সেক্ষেত্রে দরকার নির্ভরযোগ্য ডাক্তারি রিপোর্ট। ২১৭ (১) (খ) নং অনুচ্ছেদে আছে হাইকোর্টের বিচারপতির বরখাস্তের ব্যাপারে একই কারণ থাকতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে সেটা কার্যকর করতে হবে।

এটা লক্ষণীয় যে, দুটো ক্ষেত্রেই কারণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১২৪ (২) নং অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগকারী। কিন্তু তিনি বা তাঁর ক্যাবিনেট ইচ্ছে করলেই উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের বিতাড়িত করতে পারেন না। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণ প্রমাণিত করতে হয় এবং একটা জটিল পদ্ধতিও অনুসরণ করতে হয়। তাছাড়া নিয়োগের পর তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো কোনও নিয়ম-কানুন তৈরি করা যায় না— (ড. এম. ভি. পাইলী— অ্যান্ ইন্ট্রোডাক্শান টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯৬)। আসলে, এই সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, মর্যাদা, নির্ভীকতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য। এস. এল. সিক্কির ভাষায়— 'The strict proceedure for the removal of the Judges intended to ensure security of tenure which is esential to make the Judges independent and impartial'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২০২)। পদ্ধতিগত এই জটিলতার কারণেই কিছুকাল আগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রামস্বামীকে বরখাস্ত করা যায়নি। ব্যাপারটা সহজ হলে শাসকরা সামান্য কারণে বা রাজনৈতিক স্বার্থেই অপছন্দের বিচারপতিকে বিতাড়িত করতে পারবেন।

সংবাদে প্রকাশ কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ কপিল সিব্বাল ওই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ছিলেন আরও কিছু সাংসদ। কিন্তু কংগ্রেসের অনেক নেতা বুঝেছেন যে, বিজেপি বিরোধী একটা জোট গঠনের জোরালো চেষ্টা চলছে— এই অবস্থায় এটা নিয়ে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিলে এক হওয়ার প্রয়াসটাই ভেস্তে যাবে। তাছাড়া লোকসভায় বিজেপি পক্ষের বিপুল গরিষ্ঠতা আছে। দুই কক্ষে পূর্বোক্ত প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন কিছুতেই পাওয়া যাবে না। মূলত এই কারণেই তাঁরা এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে গেছেন। আর এক্ষেত্রে 'misbehabiour' বা 'incapacity' প্রমাণ করাটাও যে কঠিন কাজ হয়ে উঠবে— সেটাও তাঁরা পরে বুঝেছেন। এটা ঠিক যে, সুপ্রিম কোর্টও কোনও কোনও সময় বিতর্কিত বা বিভ্রান্তিকর রায় দিয়েছেন। কিন্তু বিচারপতিরাও মানুষও, তাঁদেরও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই যদি নেতারা তাঁদের বিতাড়িত করার ভয় দেখান, তাহলে গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও ন্যায়নীতি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে সুপ্রিমকোর্টকে রক্ষণশীলতার দুর্গ ('citadel of conservation') এবং প্রগতিশীলতার বাধা ('clog in the wheel of progress) বলে নিন্দা করা হয়— (ড. বি.সি. রাউত— ডেমোক্র্যাটিক কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া' ১৭০)। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এই আদালত শাসক ও নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে ব্যাহত করেছেন। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কেউ কেউ অবশ্য শাসকদের সাহায্য করেছেন, আবার কোনও কোনও সরকার বিচারবিভাগকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করেছেন পদোন্নতি বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে।

কিন্তু মোটের ওপর আমাদের উচ্চ আদালতগুলো প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বিশেষ করে, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান রক্ষার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'The Supreme Court plays a predominant part in the constitutional system of India'--- (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২২৪)।

এই কারণেই ড. জে. সি. জোহারি মনে করেন, অবিরত ভয় দেখানোয় বিচারকদের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা বিনষ্ট হবে। তাঁদের অসদাচরণ বা অক্ষমতার অর্থ 'mere unpopularity with the legislature' হতেই পারে না— (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৩৮৩)। সেটা হোক প্রমাণিত ও পরীক্ষিত সত্য। ■

আরও যাঁরা নিন্দায় মুখর

উজ্জ্বল নিকম, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ

কংগ্রেস এবং সাতটি বিরোধী দলের প্রধান বিচারপতিকে বরখাস্তের প্রস্তাব ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কংগ্রেসের এই আচরণে আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে সারা বিশ্বে একটা ভুল বার্তা যাবে।

আর. সোধি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে চারজন বিচারপতির আনা অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেস ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ করেছে। মনে রাখতে হবে সুপ্রিম কোর্টে আরও ২৩ জন বিচারপতি রয়েছেন। তারা এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলেননি। গোটা প্রক্রিয়াটাই অপরিণত এবং শিশুসুলভ। আমার মনে হয় ওই চার বিচারপতিকেই অপসারণ করা দরকার। অপরাধীর বিচার করে তাদের সাজা ঘোষণার অধিকার ওরা হারিয়েছেন।

ভারতের প্রধান বিচারপতি ও কয়েকটি বিরোধী দল

অশোক কুমার চক্রবর্তী

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, কংগ্রেস ও কয়েকটি বিরোধী দলের আনা ভারতের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে 'পদচ্যুত' করার প্রস্তাব খারিজ করেছেন। খারিজ করার যুক্তি ছিল যে, দরখাস্তকারীরা তাঁদের মামলার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল না এবং অভিযোগগুলি 'হয়তো' বলে অভিযোগকারীরা তুলে ধরেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রধান বিচারপতির মামলার শুনানির নির্দিষ্টকরণ তাঁরই এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে ইত্যাদি।

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব খারিজ হওয়ার পর প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সভায় বলেছেন, বিচার ব্যবস্থার সম্মান রক্ষার জন্য তিনি চারজন বিচারপতির একটি কমিটি করে দিয়েছেন। পাঁচজন বিচারপতির সংবিধানিক বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারেই প্রধান বিচারপতির এই ক্ষমতা।

কংগ্রেস দলের কয়েকজন, বিশেষ করে কপিল সিবাল উপরাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তে বেজায় চটেছেন। কংগ্রেস দল থেকেও বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে। এই প্রসঙ্গেও সিবাল বলেছেন যে তাদের মামলা প্রধান বিচারপতি নিজে কোনও ঘরে পাঠাতে পারবেন না। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী গত ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের অন্য চারজন বিচারপতির প্রেস কনফারেন্স প্রসঙ্গ টেনে তুলেছেন। তিনি আবার তাঁর বক্তৃতাটিকে 'সংবিধান বাঁচাও' প্রচার বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরাষ্ট্রপতির বিবেচনার বিরুদ্ধে সিবাল অনেক কথাই সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেস ও কয়েকটি বিরোধী দল কেবলমাত্র প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেই এই প্রস্তাব এনেছে। অন্য বিতর্কিত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে নয় এবং নিশ্চিত ভাবেই তারা জানে যে তাদের প্রস্তাব নাকচ হবে যথাযথ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার জন্য। কোনও পদচ্যুত করার প্রস্তাব যদি রাজনৈতিক হয় অর্থাৎ এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যদি বিশেষ কোনও রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়াটিই সংবিধান-বিরোধী। সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার ও গঠন থেকে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ এবং প্রশ্নাতীত। কেশবানন্দ ভারতী এবং অন্যান্য কেসে এই বিষয়টি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাবটি গত ছয় মাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র কংগ্রেস দলের আকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় (সে অযোধ্যা কেস হোক বা লোয়া কেস হোক) কংগ্রেস দল ও কয়েকটি বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব এনেছে বলে ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। সংবিধান রক্ষার জন্য উচ্চৈস্বরে আবেদন হাস্যকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

করলে সংবিধান রক্ষা করার প্রক্রিয়ার যুক্তি হাস্যকর। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরখাস্তকারী দলগুলি ভারতের নাগরিকদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, ভারতের উচ্চতম আদালতের প্রধান বিচারপতি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা না শুনলে তাঁর বিরুদ্ধে পদচ্যুত করার প্রস্তাব আনা যায়। কংগ্রেস সরকারের নিযুক্ত প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল পরাশরণ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেননি। পরাশরণ, সিবাল সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন যে, উপরাষ্ট্রপতির আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তিনি ১৯৯২ সালের ৫ জন বিচারপতির সংবিধান বেঞ্চের একটি রায় উল্লেখ করে বলেছেন যে, উপরাষ্ট্রপতির বিরোধীদের প্রস্তাবটি খারিজ করার আদেশই এই প্রস্তাবের আইনগত সমাপ্তি। সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদী তাঁর লেখায় (এপ্রিল ২২, ২০১৮, টাইমস অব ইন্ডিয়া) পরিষ্কার লিখেছেন যে, কংগ্রেস দলের দাবি অনুসারে পদচ্যুতির প্রস্তাব আনাকালীন প্রধান বিচারপতির বিচার বিভাগীয় ও শাসন কার্যাবলি থেকে অব্যহতি নেওয়ার বিষয়টি আইনে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সংবিধান বা প্রথা অনুসারে এই ধরনের অব্যহতি নেবার বিষয়টি উল্লেখ করা নেই। তিনি এই ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিজেপি সাংসদরাও যদি একইভাবে চারজন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন তাঁদেরকে পদচ্যুত করার জন্য, তাহলে বিচার বিভাগের কী অবস্থা দাঁড়াবে। তিনি এও বলেছেন যে, পদচ্যুত করার প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষেরই ব্যাপার এবং আলাদা ভাবে পাশ করাতে হয়। শুধুমাত্র রাজ্যসভায় আনা কোনও প্রস্তাবকে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হলো বলে দাবিও অযৌক্তিক। সুতরাং প্রধান বিচারপতির বিচার বিভাগীয় ও শাসন কার্যাবলি থেকে সাময়িক অব্যহতি নেবার বিষয়টিও অযৌক্তিক।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল সংবিধান রক্ষার বিষটিতে বড়ই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয় যে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিচার বিভাগের প্রতি দৃষ্টি ও কার্যক্রম। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি ঘটনা। ব্যক্তিগত স্বার্থে সংবিধান রক্ষা করা তো দূরের কথা, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতিদের টপকে প্রয়াত বিচারপতি এ এন রায়কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা, নিজের স্বার্থে বিচার বিভাগের রায়কে নস্যাৎ করার জন্য সংবিধান সংশোধন এবং পরবর্তী আইন রূপায়ণে সংবিধান বিরোধী ব্যক্তিগত রক্ষাকবচ তৈরি করা ভারতীয় গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি চরমতম আঘাত।

দ্বিতীয়ত, তৎকালীন কংগ্রেস মন্ত্রী প্রয়াত মোহন কুমারমঙ্গলম সংসদে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন সিনিয়র বিচারপতিকে (জে এম শেলাট, কে এস হেগড়ে এবং এ এন গ্রোভার) টপকে তাঁদের জুনিয়র বিচারপতি এ এন রায়কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সমর্থন করেছিলেন। এবং এই কার্যক্রমের পিছনে যে ঘটনাপ্রবাহ ছিল কংগ্রেস দলের তরফে সেগুলি সবই সংবিধান বিরোধী। জরুরি অবস্থার সময়ে প্রধান বিচারপতি এ এন রায়ের নেতৃত্বে জব্বলপুর কেসের রায় গোটা ভারতবাসীকে চমকে দিয়েছিল। এই রায় ছিল সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং বে-আইনি প্রধান বিচারপতি নিয়োগের জন্য পুরস্কার। বিচারপতি খান্না এই রায়ের সঙ্গে সহমত না হওয়ার জন্য তাঁকেও যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁরই নিযুক্ত আরও একজন প্রধান বিচারপতি এম এইচ বেগ-কে দিয়ে জরুরি অবস্থার পক্ষে রায় ঘোষণা করিয়েছিলেন। যেসব বিচারক কংগ্রেস দলের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদেরকে অবসরের পরেও অনেক সম্মানজনক পদ ও উপাধিও দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি বাহারুল ইসলাম, বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র, বিচারপতি ভি এন খারে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিচারপতি রামস্বামীর বিরুদ্ধে আনীত পদচ্যুতির প্রস্তাব কংগ্রেস দল প্রাণপণে বিরোধিতা করেছিল। তৎকালীন লোকসভার স্পিকার রবি রায়ের উপরেও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে বিচারপতির বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব গ্রহণ করা না হয়। স্পিকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং তদন্তে ১১টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। এর পরেও আজকের কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল বিচারপতি রামস্বামীর হয়ে সংসদে ছয় ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন এবং কংগ্রেস দল ভোট না দিয়ে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেছিল।

তাই প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র কংগ্রেস দলের আকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় (সে অযোধ্যা কেস হোক বা লোয়া কেস হোক) কংগ্রেস দল ও কয়েকটি বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব এনেছে বলে ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। সংবিধান রক্ষার জন্য উচ্চৈস্বরে আবেদন হাস্যকর বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বিশেষ করে সংবিধান রচনার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের অনেক রায়, বিচারপতির কর্মধারা এ কথাই প্রমাণ করে যে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে আনীত 'হয়তো' চার্জগুলি কোনও অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনীগ্রন্থ

'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' ২০০/

গান্ধীহত্যার পিছনে মূল ষড়যন্ত্রী কে বা কারা?
খুন হওয়ার জন্য গান্ধীজীর নিজের দায় ছিল কতটা?

জানতে হলে পড়ুন—

'নাথুরাম গডসে বলছি' ২৩০/

সাংবাদিক সুজিত রায়ের নতুন গবেষণাগ্রন্থ

উপন্যাসের মতোই

দে পাবলিকেশনস্
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩
ফোন : ৮৩৩৫০৩২৫৪৫

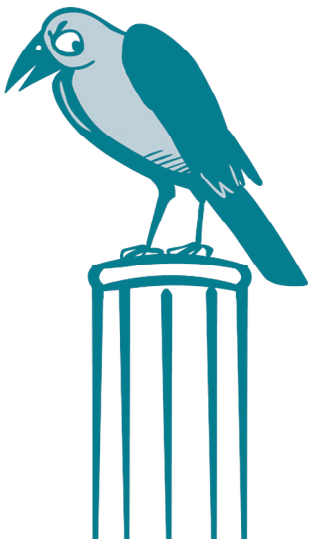

পঞ্চায়েত ভোটরঙ্গে মজে লোক রাঢ়বঙ্গে

অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে। শ্রীনিরপেক্ষ রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও সুচিন্তিতভাবে দিনটি স্থির করেছেন আগামী ১৪ মে। গণতান্ত্রিক সরকারের রাজত্বে, গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের জন্য অযথা নির্বাচন নির্ঘণ্ট দীর্ঘায়িত করার কোনও অর্থ হয় না। এই তো ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার মিছিমিছি কত জল ঘোলা করলেন। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্ট; কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করলেন। কিন্তু সরকারে পার্টির প্রতি 'জনমতের' বিপুল সমর্থন আটকাতে পারলেন কি! কেননা সরষের ভেতর ভূত থাকলে, সে ভূত তাড়ানো বড়ো শক্ত।

আসলে অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। ঘটে বুদ্ধি থাকলে নিশ্চয়ই বোঝা যেত যে, 'জনমত' যেখানে 'জাগ্রত' সেখানে কার সাধ্য রোধে তার গতি। জাগ্রত জনমত যেখানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ন্যায়দণ্ড তথা বংশদণ্ড নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো হাজির, সেখানে বিভ্রান্ত-বুদ্ধি কতকগুলি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের অযথা বিক্রম প্রকাশ করতে গেলে যা হয় আর কী! ওরে বুদ্ধু, সোজাসাপটা কথাটা বুঝতে হয়, সরকার যার, পুলিশ তার; পুলিশ যার গুণ্ডা তার; গুণ্ডা যার ডান্ডা তার; ডান্ডা যার নির্বাচন তার। মহান বামপন্থী আমল থেকেই এটি গণতান্ত্রিক বাংলার গণসংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। ডাণ্ডার রঙ লাল থেকে নীল হলেও ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

আমরা সংস্কৃত হিতোপদেশে পড়েছি, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেষু কুতো বলম্।' এইটি হলো আসল কথা; নির্বোধের সবচেয়ে বড় জ্বালা, তার যে বুদ্ধি নেই, সেই বোধও নেই। সেই বোধ থাকলে, সে অবশ্যই নিজের বলহীনতার কথা বুঝতে পারত এবং পুলিশ, গুণ্ডা ও ডাণ্ডার মহিমা ছাড়াই বঙ্গীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ানোর খ্যায়েশ করতে পারত না। কিন্তু এঁড়েবুদ্ধির প্রকোপে, হাইকোর্টের নির্দেশে, নির্বাচন কমিশনের ঠাট্টা বুঝতে না পেরে, ভোটের ফাঁদে পা দিয়েছো কী গেছ গিয়া। তবে হ্যাঁ, পুলিশের পুতুলনাচ দেখে যদি চক্ষু সার্থক করতে চাও, তবে ভোটের অফিসে কদম কদম বাঢ়ায়ে যা; খুশিসে ডান্ডা খায়ে যা।

তবে বাইরে যাই ঘটুক, গলায় গানটা কিন্তু গেয়ে যেতে হবে, তবে না সংস্কৃতির জাত বাঙালি। এখন আবার সেটা গিয়ে ঠেকেছে বিশ্ববাংলা সংস্কৃতিতে। এটা বোশেখ মাস, কবিগুরুর জন্ম মাস। ডান্ডার তালে তালে গাইতে হবে, নির্বাচনের থিম সঙ, 'আরো আরো প্রভু আরো, এমনি করে আমায় মারো।' এই বিশ্বসংস্কৃতিতে কিন্তু নারী পুরুষ সব সমান। সুতরাং যেসব প্রগলভা নারী তাদের গৃহের গুরুদায়িত্ব ভুলে, সংরক্ষণের কল্যাণে, পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে আসেন, খোঁয়াড় চিনতে না পারলেই উত্তম মধ্যমের এক শেষ। নারী বলে তারা মোটেই পার পেতে পারেন না। নারীদের জন্যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে আলাদা কোনও নিয়ম নেই। সুতরাং ভোট কোডেই আলাদা ব্যবস্থার যুক্তি কোথায়। তবে তাদের সম্পর্কে বীরপুঙ্গবদের একটি বিশেষ ধারা আছে, তা হলো তাদের শাড়ি ধরে টানাটানি করা। এবং মস্তান তারকা, নেতার নিদান, বেশি বাড়াবাড়ি করলে রেপ করিয়ে দেওয়া। এটাই এখন আমাদের বিশ্ববাংলার মহান কালচার।

তবে তবু ভালো প্রার্থীপদ জমা দেওয়ার পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে মিটে গেছে। চিরকাল যা হয়, কিছু কুটচক্রী সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বেসুরো গাইতে শুরু করেছে। ক্যামেরার কারসাজিতে উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে স্বচ্ছ সতী গ্রিন পার্টির নামে কলঙ্ক করলেই হলো। অবশ্য কিছু অতি উৎসাহী গ্রিন কেষ্টা-গোষ্টা যে এদের মিথ্যাচারের উচিত জবাব দিতে পেরেছে সেটাই রক্ষে। কই, সাধারণ জনমতের ধারক ও বাহক প্রসাদপুষ্ট বকলসপরা বুদ্ধিজীবীদের মুখে তো কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। এই তো সেদিন রামনবমীর অস্ত্রমিছিল দেখে তেনারা শিউরে উঠে সরব হয়ে মিছিল করতে যান আর কী! কিন্তু পুলিশি বন্দোবস্তের অভাবে সেটা ভেস্তে যায়। এইরকম সজাগ বুদ্ধিজীবী, কবি-শিল্পীদের কাছ থেকে যখন কোনও সাড়াশব্দ নেই, সুতরাং ওসব চাক্ষুষ গুজবে কান দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

যদিও নির্বাচনের ফলাফল সকলেরই জানা, কেননা উঠনতিমূল পত্তনেই চেনা যায়। নির্বাচন প্রাকপর্বেই প্রমাণ হয়ে গেছে ফল কী হবে। সেই ইলেকসন ট্রেন্ড লক্ষ্য করেই অন্তরাত্মার নির্দেশে স্বয়ং গ্রিন সুলতানা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, জনজোয়ারে একশোভাগ আসনই জনপ্রিয় গ্রিন পার্টির দখলে অবধারিত। তবে গণতন্ত্রের একটা দায় আছে। ফল যতই অবধারিত হোক, গণতান্ত্রিক ধারাটি অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। এবং সেটির ভার অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের পাখি পড়ানো ভোম্বলদাস প্রধানের হাতে। এখন কেবল সংখ্যাতত্ত্বের খেলা। কাক্কেশ্বর কুচকুচের হিসাব মতো, 'সাত দুগুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

এই হাতেই রইল পেনসিলটিই হলো আমাদের পঞ্চায়েত প্রথার মূল রহস্য। পঞ্চায়েত নিয়ে সেই সংবিধান রচনার দিন থেকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনেক মতবিনিময় অনেক জলঘোলা হয়ে চলল, কিন্তু অবশেষে হাতে সরকারি ক্ষমতার পেনসিল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত আইন, রাজ্য পঞ্চায়েত আইন, কংগ্রেসি

পঞ্চায়েতি আইন, কমিউনিস্ট পঞ্চায়েত আইন, সব পথ শেষে মিলে গেল এসে, সরকারি পঞ্চায়েতি নির্বাচনের প্রহসনে। কেননা একদিকে যেমন, সরকার যার পঞ্চায়েত তার, তেমনি অন্যদিকে পঞ্চায়েত যার সরকার তার। মেরে কেটে পঞ্চায়েতটা দখল করতে পারলে, রাজত্ব কায়েম করা হাতের মুঠোয়। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক গুণ্ডা রাজনীতির মূল কথা হলো পঞ্চায়েত আমাদের ভিত্তি, সরকার আমাদের ভবিষ্যৎ।

সেই জন্যেই পঞ্চায়েতগুলি যাতে জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক না হতে পারে, সেই সংবিধান রচনার দিনগুলি থেকেই ছিল তার দিকে নজর। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে লালিত গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার যুক্তিতে অনেকেই পাশ্চাত্যের দলভিত্তিক রাজনীতি প্রচলনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. বি আর আম্বেদকর তার তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এই গ্রামরাজগুলিই ভারতের ধ্বংসের কারণ। যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণ এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ভিত্তি করেই তাঁর বেসিক ডেমোক্র্যাসির তত্ত্ব খাড়া করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনও পরিণত বয়সে দলহীন রাজনীতিভিত্তিক বেসিক ডেমোক্র্যাসির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। কেননা স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই, দেশের রাজনীতিতে লুম্পেন তথা মূর্খ বাহুবলীর প্রাধান্য স্পষ্ট হতে থাকে। দলীয় রাজনীতিকে কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে, রাজনীতিতে লুম্পেনদের প্রাধান্য আরম্ভ হয় কেন্দ্রে মহীয়সী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ্যে সর্বহারার মহান নেতা জ্যোতি বসুর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে।

আরব্য উপন্যাসের কলসিমুক্ত দৈত্যের মতো, সেই গুণ্ডা রাজনীতিই আজ সারা দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। সংসদে, সেই গুণ্ডারাজনীতির প্রাবল্যেই আজ সংসদ অচল। সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে সামান্য গ্রাম পঞ্চায়েত অবধি দলীয় রাজনীতির নামে সেই গুণ্ডা রাজনীতিরই দাপাপাপি। দলীয় রাজনীতির নামে দেশে চলছে দলের সুপ্রিমো এক ও তার পশ্চাতে ধান্দাবাজ মারাদাঙ্গা পার্টির শূন্যির দল। দেশে আজ দল রাজনীতির যে বীভৎস রূপ সারা সমাজকে বিষিয়ে তুলেছে তার শুরু এই পঞ্চায়েত থেকে।

তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে একদিকে এই গুণ্ডার দাপাদাপি, অন্যদিকে বৃহন্নলা নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসন। বছরের পর বছর, একইভাবে সকলের চোখের সামনে গুণ্ডাবাজি করে ভোটে প্রার্থীপত্র জমা দিতে না দেওয়া, ভোটারকে ভোট দিতে না দেওয়া ও শেষে বিপুল ছাপ্পা ভোটে জয়ীকে নিয়ে আবির উড়িয়ে বীভৎস দাপাদাপি অতি প্রত্যক্ষ ঘটনা। পরবর্তী পাঁচ বছর তিনিই হন পাড়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও চিচিং ফাঁকের কল্যাণে ক্রোড়পতি। দীর্ঘ বামপন্থী প্রগতিশীলতায়, তখন যারা রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে, নিজের ভোট নিজে দিন, বলে গণতন্ত্র রক্ষায় সরব হতেন, আজ দেখ, তাহাদের গণতান্ত্রিক বিরাট স্বরূপ। গণতন্ত্রের সুপরিকল্পিত ধর্ষণ চলছে প্রকাশ্যভাবে, গণ গড্ডলিকা প্রবাহের নীরব সম্মতিতে।

কী রেড ব্রিগেড আর কী গ্রিন ব্রিগেড, যে নগ্ন নির্লজ্জতায় প্রকাশ্যে এই কুনাট্যরঙ্গ দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে পারছে, তার কারণ তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সিস্টেমের সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকারের এক চাকরিজীবী আমলা যদি নির্বাচন কমিশনার হন, তাহলে তাঁর পক্ষে কি সম্ভব সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনওরকম প্রতিবাদ করা। বিবেকবোধ বর্জিত না হয়ে নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় যদি কমিশনার তৎপর হন তাহলে মন্ত্রীবেশী গুণ্ডারা কীভাবে তার গলা টিপে ধরতে উদ্যোগী হন, তার বিষম পরিণাম বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কমিশনারের হাল দেখেই বোঝা গেছে। অতএব চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, বলে গুণ্ডা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে ছাপ্পা দিয়ে প্রমোশনের পথ দেখাই হলো কমিশনারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সকলের সামনে বছরের পর বছর একই সরকার পার্টির একই নাটক সুঅভিনীত হয়ে চলেছে, কিন্তু এর সমাধান নিয়ে কারোর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সমাধানটা খুব যে দুরূহ তা কিন্তু মোটেই নয়। প্রথমত নির্বাচন কমিশন ও কমিশনারকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের অধীনতা থেকে বের করে আনতে হবে। সাংবিধানিকভাবে রাজ্য প্রশাসনের বাইরে, প্রয়োজনে সর্বভারতীয় ক্যাডার থেকে, রাজ্যপালের অধীনে পাঁচ বছরের মেয়াদে কমিশনারকে নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া অন-লাইনের মাধ্যমে করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়। পাসপোর্টের আবেদন যদি অন-লাইনের মাধ্যমে করা যায়, তাহলে নির্বাচনে সেটা করা অসুবিধে থাকতে পারে না।

তারপরে আসে নির্বিঘ্নে ভোটদানের ব্যবস্থা, যেখানে রাজ্য পুলিশকে সম্পূর্ণ বাইরে রাখতে হবে। গত নির্বাচনে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও, তাদের নিষ্ক্রিয় ও বিপথচালিত করার জন্যে সব সময়ই রাজ্য পুলিশের দলদাসরা প্রস্তুত। হলদিয়ার পুর নির্বাচনে পুলিশ অফিসার অলোক রাজ যেমন লক্ষ্মণ শেঠের অতি তৎপরতা বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন, কিংবা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনী লাল ব্রিগেডকে হিমঘরে পাঠিয়েছিল, সেগুলিই প্রমাণ করে যে নির্বাচন গুণ্ডামুক্ত করা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রয়োজনে গুণ্ডার সর্দারদের নির্বতনমূলক আইনে জেলে ফিস্টি করার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

তবে দেশে জাজ্বল্যমান মূর্খ এই গুণ্ডা রাজনীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে গেলে, অবিলম্বে আইন সংশোধন করে দলহীন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। ফলে দলের গুণ্ডার সর্দারদের বদলে, সুবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামের বিশিষ্টজন, ডাক্তার, ব্যবহারজীবী, শিল্পোদ্যোগী, কৃষিউদ্যোগী প্রমুখ দলের মতামতের বাইরে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। যেমন আগেকার ইউনিয়ন বোর্ডে হতো। নির্বাচিতদের ভোটে একজন প্রধান হবেন এবং অন্যান্য পদাধিকারী থাকবেন। সেখানে দলের কোনও প্রাধান্য থাকবে না। এবং এই পঞ্চায়েতে যাঁরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন তাঁরাই পরে রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্যে যে সদিচ্ছার প্রয়োজন তার হদিশ নেই। অতএব দে গোরুর গা ধুইয়ে। ▮

মে দিবসের বিকৃত ভাবনা দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বনাশই করেছে

সাধন কুমার পাল

'ওদের মিথ্যা কথার ফানুস, ফাঁসলো দেখে হাসছে মানুষ'। 'ঐতিহাসিক' মে দিবস নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই মধু গোস্বামীর লেখা ছড়ার এই লাইনটি মনে পড়ছে। এক সময় বামপন্থীরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সুর করে এই ছড়াটি গাইতো। বামপন্থীদের দুর্দশা দেখে এখন মনে হয় যে, ওদের গাওয়া গানের ধ্বনি আজ যেন প্রতিধ্বনি হয়ে ধেয়ে যাচ্ছে ওদের দিকেই। বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসছে প্রকৃত ইতিহাস। মে দিবস, মহান অক্টোবর বিপ্লবের মতো ওদের দুনিয়া কাঁপানো কর্মসূচীগুলি যে পরিকল্পিত মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকাশিত হচ্ছে সেই সত্যও। মান্যতা পাচ্ছে সেই চিরন্তন সত্য, কিছু মানুষকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো গেলেও সমস্ত মানুষকে দীর্ঘদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না।

১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি আর দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেটিকে স্মরণ করেই মে দিবস পালিত হয়। ইতিহাস বলছে প্রতিবাদীদের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আন্দোলনটি সমাপ্ত হয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ ব্যর্থ একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। ইতিহাস বলছে, সরকার আট ঘণ্টা কাজের দাবি আগেই মেনে নিয়েছিল এবং ইউ এস কংগ্রেস ১৮৬৮ সালে এই বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাশ করে। ১ মে তারিখের ধর্মঘট ছিল শান্তিপূর্ণ। এই ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। মে দিবস স্মরণ করতে গিয়ে যে হিংসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করা হয় সেটি ঘটেছিল ৩ ও ৪ মে এবং ১ মে-এর আন্দোলনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। দুটি বিবদমান শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে অনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলস্বরূপ এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। ৩ মে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী একটি দুর্বল কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ধর্মঘট ডেকেছিল এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে যাতে চারজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৪ মে এই ঘটনার প্রতিবাদে হে মার্কেটে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য প্রতিবাদ সভাটি বাতিল হলেও ওই গোষ্ঠীর কিছু মানুষ সেখানে থেকে যায় এবং কর্তব্যরত পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ করে।

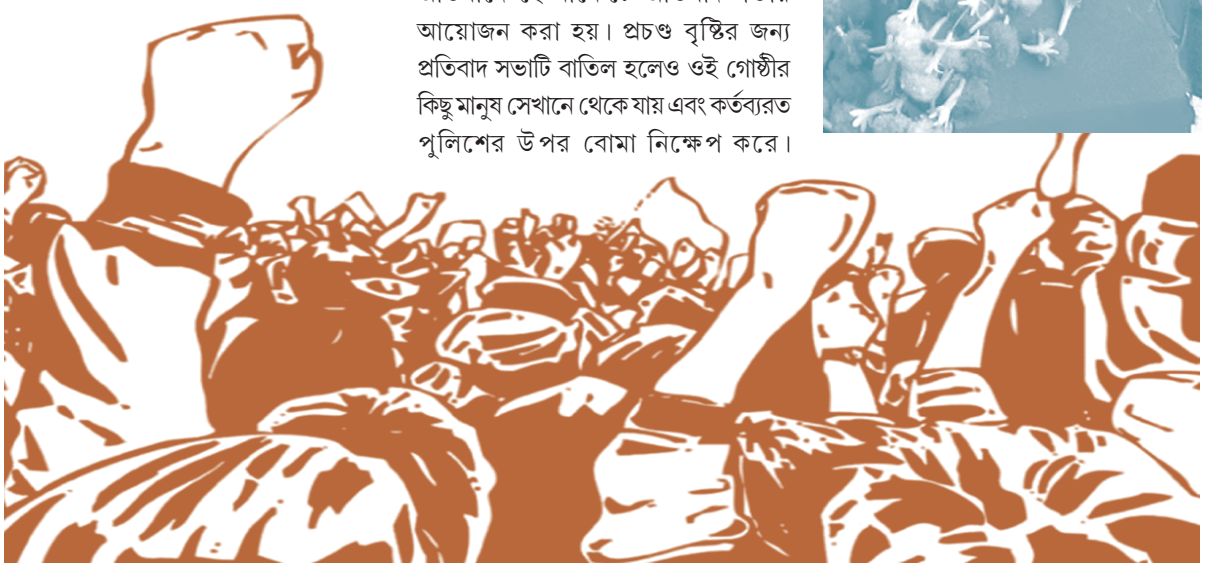

স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এই ঘটনায় ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার জেরে চার জনের ফাঁসি ও অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতার জেল হয়। এই ঘটনার ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস হে মার্কেটের হিংসাত্মক ঘটনাকে শ্রমিক আন্দোলন হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রত্যেক সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে। এক সময় মে দিবস শিশু দিবস হিসেবেও পালিত হতে শুরু করে।

১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ১ মে শ্রমিক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কমিউনিস্ট দুনিয়াতেই মে দিবস একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে ওঠে এবং অবশেষে ১৯০৪ সালে এই দিনটিকে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। রাশিয়াতেই এই দিনটি রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন দাবি আদায় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হতে থাকে।

ফ্যাসিস্ট হিটলারের আত্মপ্রকাশের পর সমস্ত পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্টরা ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ১ মে 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ডে' পালন করতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী একনায়ক হিটলারের সঙ্গে জোসেফ স্টালিনের জোট তৈরি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই কমিউনিস্টদের পক্ষে আর ১ মে-তে হিটলার বিরোধী 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ডে' পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না। মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন স্টালিন এবং ১ মে আবার শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের ফতোয়া জারি করলেন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

শুধু কমিউনিস্টরাই নয়, আই এন টি ইউ সির মতো কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনসহ ভারতের বিভিন্ন দলের শ্রমিক সংগঠন প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত না হয়ে ভ্রান্ত প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ১ মে শ্রমিক দিবস পালন করে আসছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির মতো বিভ্রান্ত হয়নি। ফলে বিশ্বের অনেক দেশেই ১ মে দিনটিকে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে না। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ডের মতো উল্লেখযোগ্য দেশ ছাড়াও বাংলাদেশ, জামাইকা, কাজাকস্থান, ট্রিনিদাদের মতো ছোট ছোট দেশও ১ মে শ্রমিক দিবস পালন করে না। যেমন বাংলাদেশে 'গারমেন্ট শ্রমিক সংহতি' নামে একটি সংগঠন ওই দেশের রানা প্লাজা বিল্ডিং দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণ করতে প্রতিবছর ২৪ এপ্রিল শ্রমিক নিরাপত্তা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। কমিউনিস্টদের অপপ্রচারে কান না দিয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘও বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে জাতীয় শ্রমিক দিবস পালন করে থাকে। ভারতের অনেক রাজ্য সরকার বিশ্বকর্মা জয়ন্তীকে সরকারি ভাবে শ্রমিক দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে কর্মকে যজ্ঞ হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বকর্মা শ্রমের মর্যাদার প্রতীক এবং প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। ভারতের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যারা ইতিহাস গড়েছেন তারা সবাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা হিসেবে বিশ্বকর্মার প্রতি সমর্পণের ভাব নিয়ে কাজ শুরু করতেন। ঋকবেদে উল্লেখ রয়েছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি যজ্ঞে বিশ্বকর্মা নিজেকে হবি হিসেবে সমর্পণ করেছেন। সে জন্যই তিনি দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছেন। তিনি দেবলোকের সবচেয়ে বড় আর্কিটেক্ট হিসেবে পরিচিত। এমন বিশ্বাসও আছে যে, বিশ্বকর্মা কোনও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন। যে সমস্ত বরণীয় কর্মদক্ষ মানুষ নিজেদের দক্ষতা উজাড় করে সমাজকে সেবা করে গেছেন তাদেরকে বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত করা হয়। পুরাণে উল্লেখ রয়েছে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের রথ, পাণ্ডবদের জন্য হস্তিনাপুর নগরী, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী, রাবণের লঙ্কা, পুষ্পক বিমান এইগুলি সবই বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। বাস্তুশাস্ত্র সম্মত নির্মাণ শাস্ত্র এবং সমস্ত শিল্পকলা বিশ্বকর্মার সৃষ্টি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তিনিই ছিলেন বিশ্বের প্রথম শ্রমিক এবং শ্রমাচার্য। ভারতবর্ষে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের বিশ্বকর্মার উত্তরসূরী বলে মনে করে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তিনি সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের আদর্শ স্বরূপ।

বিশ্বকর্মার আসুরিক প্রকৃতির ও লোভী পুত্র বৃত্র ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সেনাধ্যক্ষ। এই আসুরিক প্রকৃতির পুত্রকে বধ করার জন্য বিশ্বকর্মা নিজেই অস্ত্র তৈরি করেছিলেন। পুরাণে উল্লেখ রয়েছে যে, বিশ্বকর্মা ও দধীচি মুনির সর্বোচ্চ ত্যাগের ফলেই বৃত্রাসুর নিহত হয়েছিল। বিশ্বকর্মার অপর পুত্র নল ছিলেন রামভক্ত। রামায়ণে উল্লেখ আছে নলের তত্ত্বাবধানেই লঙ্কায় যাওয়ার জন্য রামসেতু নির্মিত হয়েছিল।

আধুনিক শ্রম জগতে বিশ্বকর্মা ভাবনাত্মক পরিবর্তনের প্রতীক। ভারতীয় পরম্পরায় পারিবারিক সম্পর্কের রসায়নের উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠে। কর্মকে যজ্ঞ হিসেবে দেখা হয়। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পরিবার রসায়নকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই ধারণা থেকেই 'শিল্প পরিবার' স্লোগানের জন্ম হয়েছে। পশ্চিমি সংস্কৃতিতে শিল্প গড়ে ওঠে মালিক শ্রমিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। কমিউনিস্ট ভাবধারায় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সম্পর্কের রসায়ন তৈরি হয় শ্রেণী শত্রু, শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব দিয়ে। ফলে মে দিবসের ভাবনা থেকে উঠে আসা 'ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'মানছি না মানবো না' স্লোগান বছরের পর বছর ধরে দেশে দেশে বহু শিল্পের ধ্বংসের কারণ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বনাশ করেছে।

বিশ্বকর্মার সমতুল্য মহান কর্মবীরদের জীবন বিশ্লেষণ করে তৈরি হওয়া ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পৃক্ত 'ত্যাগ-তপস্যা-বলিদান', 'কাজেই পূজা' ইত্যাদি স্লোগান এখন শিল্প জগতের পরিবেশ পাল্টে দিচ্ছে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলি ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটিকে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী চালানো ওদের নানা পরিকল্পিত মিথ্যাচার, ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। ফলে কমছে মে দিবস নিয়ে উন্মাদনাও। ■

বাবাসাহেব আম্বেদকর জাতীয় নেতা

পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্য ইতিহাস বইগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনাসমূহ সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা আবশ্যিক, আশ্চর্যজনক ভাবে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কেই পাঠ্য বইগুলি নীরব অথবা অতি দায়সারা গোছের! এরই একটি অন্যতম বিষয় হলো বাবাসাহেব আম্বেদকর। বাংলার ইতিহাস বইগুলিতে তিনি হলেন কতকটা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'র মতো। অর্থাৎ, ইতিহাসে তিনি পরিচয় লাভ করেছেন শুধুমাত্র স্বাধীন ভারতের আইনপ্রণেতা এবং দলিত-নেতা হিসেবে, যার নীচে চাপা পড়ে গেছে তাঁর ব্রিটিশ ও নেহরু শাসিত ভারতে সুচিন্তিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ তথা ভারত ও সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং অগাধ মেধার কথা। দলীয় স্বার্থের দিকে চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনও সরকারই আম্বেদকরের সমগ্র জীবন নিয়ে চর্চার অবকাশ রাখেননি কখনো। যার ফলে ড. আম্বেদকর সম্পর্কে বাঙালির উন্নাসিকতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই মহামানবকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি যে ধারণাটি আমাদের আচ্ছন্ন করে তা হলো তিনি শুধুমাত্র অস্পৃশ্য নিচুজাতের নেতা। কিন্তু ধারণাটি সর্বৈব ভ্রান্ত। হ্যাঁ, একথা সত্য যে তিনি সারা জীবন অস্পৃশ্য জাতির হয়ে সংগ্রাম করে গেছেন, তা বলে তিনি কখনোই হিন্দু বা ভারতবিরোধিতা করেননি।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল আম্বেদকরকে তাদের প্রচারে ব্যবহার করছে শুধুমাত্র একজন দলিত নেতা হিসেবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই অপচেষ্টার একমেবাদ্বিতীয়ম কারণটি হলো দলিত ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরা দলিত সমাজের প্রকৃত সঙ্কটমোচনে অপারগ থেকে যাচ্ছে। ফলে দলিত শ্রেণীর প্রকৃত উন্নতিটি যেমন হচ্ছে না, বরং দলিত ইস্যুকে কেন্দ্র করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি, যাদের মূল লক্ষ্যই হলো— 'ভারত তেরে টুকরা হঙ্গে' কিংবা 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'। অন্যদিকে এই সুযোগে বিভিন্ন জেহাদি সংগঠনগুলিও ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মুসলমান-দলিত কাল্পনিক ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে। উভয় রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি কখনো একত্রে, কখনো আলাদাভাবে দলিত ইস্যুকে কেন্দ্র করে আবেগপ্রবণ ভাষণ ও কাজের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে। আম্বেদকরের সম্পর্কে সামান্য চর্চা করলেই জানতে পারা যায় যে, তিনি মননে চিন্তনে একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। দলিতদের জন্য পৃথক মন্দির নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন— আমি এমন কোনও কাজ করব না যাতে ভারতের কোনও রকম ক্ষতি হয়। এই কারণেই জিন্না পাকিস্তানের দাবি তুললে বাবাসাহেব তার প্রচণ্ড নিন্দা করে দেশভাগের বিরোধিতা করেন। আবার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সনাতন সংস্কৃতিজাত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন তাঁর অগণিত অনুগামীদের নিয়ে, যাতে তারা ভারতীয় হয়েই থাকে এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ না করে।

—ঋদ্ধিমান রায়,
কলকাতা-৭০০০৯৬

ভারতীয় ভাষার গুরুত্ব

গত ২৫ চৈত্র ১৪২৪ (৯ এপ্রিল ২০১৮) সংখ্যায় মাননীয় বিজয় আঢ্যবাবুর ভারতীয় ভাষা তথা মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত লেখা বর্তমান সময়ের এক সর্ব আলোচিত বিষয়। আজকে বিশ্বায়নের যুগে যে 'one globe one language' এর দৌড় চলছে তাতে ভারতের মতো

বহুভাষিক দেশের মাতৃভাষাগুলি আত্মহত্যার সম্মুখীন। People Linguistic Survey of India ২০১০-এ ভারতের ৭৮০টি ভাষাকে নথিভুক্ত করে যার ৬০০টি ভাষা আজ আত্মহত্যার পথে। এই সংস্থাটির মতে গত ৬০ বছরে ২৫০টি ভাষা আত্মহত্যার শিকার।

ভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের বাহক। মাতৃভাষা আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। তাই আজ আমাদের দেশে শুধু ভাষাই নয়, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিও আত্মহত্যার দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

আজ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মাতৃভাষাগুলির সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে ভাষার সংরক্ষণ শুধু কাগজে- কলমে করাটাই যথেষ্ট নয়। ভাষার প্রচার আবশ্যক। কোনওরকম সন্দেহ ছাড়াই বর্তমান যুগকে ইন্টারনেটের যুগ বলা যেতে পারে।

যদি ইন্টারনেট জগতে দেশের বিভিন্ন মাতৃভাষাগুলিকে নিয়ে আসা যায় তাহলে মাতৃভাষার ব্যবহার ও এর সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। টিভি ও রেডিও-র মাধ্যমে মাতৃভাষায় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের দ্বারা এবং মাতৃভাষায় সংবাদপত্র ও পত্রিকার আগমন, শুধু ভাষার সংরক্ষণ নয়, একই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সেই ভাষার কিছু মানুষের জীবিকার পথ সুগম করে দেওয়া যায়।

—আকাশ ভগত,
বুলবুল চণ্ডী, মালদা।

সংশোধনী

স্বস্তিকার ২৩.০৪.২০১৮ সংখ্যার ৪৭ পৃষ্ঠায় নীচের ছবিটিতে উপস্থিত শ্রোতাদের ছবিটি তুলেছেন স্বপন পাল।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ নারীসমাজ

অঙ্গনা

কৈবর্ত্যকুলোদ্ভবা ধনাঢ্য রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারির পদে ব্রতী হয়ে তথায় বাস করিতে থাকেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল— সে প্রভাবের সম্যক পরিচয় সম্ভবত তিনি নিজেই পান নাই, তাঁহার গুরুদেবের শিষ্যমণ্ডলী যে ধর্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন। এক হিসাবে তাহার মূলে ছিলেন অনুচ্চশ্রেণীর এক মহিলা, লৌকিক ভাবে বলিতে গেলে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইত না, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা হইত না এবং বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী নির্মাণের উপরই এই ঘটনা পরম্পরা নির্ভর করিতেছে। উহাও আবার অনুন্নত-সম্প্রদায়- সম্ভূতা জনৈকা ধনাঢ্য রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ।

আমাদের আচার্যদেব, অন্তত তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। ...বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোনও গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ওই চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত এবং সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, ''কখনও ভুলিও না, 'স্ত্রীজাতি এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধন'— ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।''

স্ত্রীজাতি এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক— তাহাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সমর্থ হইবে— তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহা বুঝিতেন এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ...চপলমতি, বিলাসিনী এবং জাতীয়তাভ্রষ্টা নারী হৃত বাহ্য পরিপাট্য সত্ত্বেও তাঁহার মতে শিক্ষিতা নহে, বরং অধঃপতিতা। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারী জীবনও কেবল লোক-দেখানো ব্যাপার নহে। আর যে-স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহের প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষা-পদবাচ্যই নহে।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণী একেবারে অতীতের ধ্যানশক্তি-রহিতা হইবে, ইহা তিনি কিছুতেই চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাব খোয়াইয়া নহে।

আগামী যুগের স্ত্রীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে।

নারীকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহা হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম বা বালিকাবিদ্যালয় ও কলেজের তিনি কল্পনা করিতেন। তিনি বলিতেন—যাঁহারা তথায় বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংস্করণ এবং পশুচর্যা— এগুলি দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে হওয়া চাই। ধর্মই এই নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির অস্থিমজ্জারূপ হইবে, ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ওইগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এববিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয়মাসকাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপ এক শ্রেণীর নারীর সৃষ্টি হইবে। তাহাদের অন্য কোনো গৃহ থাকিবে না; সেখানে তাহারা কাজ করিবে তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে, ধর্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনও বন্ধন থাকিবে না; এবং গুরু, স্বদেশ ও আপামর সাধারণ এই তিনের প্রীতি ব্যতীত অপর কোনও প্রীতি থাকিবে না। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন, এবং তিনি এইরূপেই তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীতে তিনি 'শক্তি'— এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন, কিন্তু শক্তি কাহাকে বলে— এই বিষয়ে তিনি কি কঠোরভাবে বিচার করিতেন! নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস— এ দুয়ের কোনওটিরই তিনি প্রশংসা করিতেন না। মৌন, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত সেই প্রাচীনকালের চরিত্রসমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেইসঙ্গে আবার বর্তমান যুগের ভারতের চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার আছে। মধ্যে লিঙ্গবিচার চলে না।

কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক সহজ ও সবল-চরিত্র এবং বুদ্ধিসহায়ে সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের মন্ত্রস্বরূপ পরিণত করিতে পারিবেন না— এবিষয়ে তিনি কোনও কারণই খুঁজিয়া পাইতেন না। প্রথম, নারীকে সমাজের আদর্শগুলি নতশিরে গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালিনী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দেশ ও সুযোগগুলি অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ওই সকল কর্তব্য পালন করিয়া ও ওই সকল সুযোগগুলি অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ওই সকল কর্তব্য পালন করিয়া ও ওই সকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ক্রমশ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় ভাবাপন্ন হইবেন এবং উন্নতির এইরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই।

(ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।)

সংগ্রাহক : সুতপা বসাক ভড়

কাঠুয়ার ঘটনা কিছু প্রশ্ন, কিছু চিন্তা

প্রবাল চক্রবর্তী

বহুদিন আগের ঘটনা সেটা, কিন্তু আজও পরিষ্কার মনে আছে। একটা জরাজীর্ণ মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঠাকুরমাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করতে ঠাকুরমা বলেছিলেন, আমার প্রাণের দেবতা যে ওখানে বন্দিদশা কাটাচ্ছে, তাই কাঁদছি। ঠাকুরমার সঙ্গে সেবার কাশী বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলাম। যেদিন ঠাকুরমাকে কাঁদতে দেখেছিলাম, সেদিনই বিকেলবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে স্থানীয় এক দোকানদারের মুখে শুনেছিলাম কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হওয়ার ঘটনাটা। বাদশা অওরঙ্গজেব তখন স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে কাশী বেড়াতে এসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রটে গেল, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোহিতরা নাকি অওরঙ্গজেবের এক স্ত্রীকে মন্দিরের ভেতর আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে। অওরঙ্গজেব আদেশ জারি করলেন, শাস্তিস্বরূপ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া হবে। সবার চোখের সামনে সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন সৌধ, আসমুদ্র হিমাচল সব হিন্দুর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু ধ্বংস হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় লজ্জায় অধোবদন হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ভাবতেই পারল না। কেউ কেউ তো এমনও বলল, যে মন্দিরে এরকম নারকীয় কাজ হয়েছে, সে মন্দির ধ্বংস হওয়াই বিধেয়। দু-একজনের মনে কিছু সন্দেহ জেগেছিল। বাদশার বেগম মন্দিরের ভেতরে কী করতে গিয়েছিলেন? মন্দিরের পুরোহিতরা খামোখা একাজ করতে গেলই বা কেন, বিশেষ করে বাদশার বেগমের সঙ্গে? এর ফল কী হবে, সেটা কি পুরোহিতরা জানত না? আর মন্দিরের মধ্যেই কেন, আর কি কোনও জায়গা ছিল না কাশীতে? কিন্তু প্রচারের ঢক্কানিনাদে সেসব সন্দেহ চাপ পড়ে গেল।

জম্মুর কাঠুয়ার বাসিন্দা আট বছরের মেয়ে আসিফার ধর্ষণ ও মৃত্যু নিয়ে সারা দেশ এখন তোলপাড় হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেই কয়েকটা কথা মনে হল। আসিফা আমাদের বোন, আমাদের মেয়ে। ওর সঙ্গে যে বা যারা এরকম ঘৃণ্য নারকীয় অপরাধ করেছে, কোনও শাস্তিই সে বা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আর সে শাস্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া প্রয়োজন। নাহলে আসিফার সঙ্গে ন্যায়বিচার হবে না। কিন্তু পূজা, কমলা, নির্ভয়া? ওরা কি আমাদের মেয়ে নয়? বোন নয়? গত ক'মাসে অসমে বহু মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের হাতে। বিহারে, মহারাষ্ট্রে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার নারকীয় ঘটনা ঘটেছে হালে। কর্ণাটকে ন'জন 'সংখ্যালঘু' মিলে একটি মেয়েকে বন্দি করে ধর্ষণ করেছে লাগাতার। এগুলো কি কোনও অংশে কম অপরাধ? তাহলে এই ঘটনাগুলো কেন দেশের বিবেককে নাড়া দেয় না? যে ন্যায়বিচার আসিফার প্রাপ্য, সেই একই ন্যায়বিচার কি ওদেরও প্রাপ্য নয়? গার্ডেনরিচের বিনোদ দাসের মেয়ে যখন মাসের পর মাস কলকাতার 'মিনি পাকিস্তান'-এ বন্দিনী অবস্থায় ধর্ষিতা হয়, বলিউড ও মিডিয়া কেন তখন মুখে কুলুপ এঁটে থাকে? দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গল হলেই এদের বিবেক জাগে। বাকি সময় এদের মনোভাব হল, 'এমন তো কতই হয়"! কেন এই দ্বিচারিতা?

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপার্ষদ খেতে বসেছেন, সঙ্গে গোপাল ভাঁড়। বেগুনের তরকারি খেয়ে রাজার খুব ভালো লেগেছে। উনি বললেন, বেগুনের মতো সবজি আর হয় না। শুনে গোপাল ভাঁড় বলল, বেগুন তো মর্তের অমৃত। রাজা বললেন, আজ থেকে রোজদিনই বেগুনের তরকারি চাই। সাতদিন প্রতিদিন বেগুন খাওয়ার পর রাজা বললেন, আর ভালো লাগছে না, বেগুন একটা বাজে সবজি। শুনে গোপাল বলল, বেগুন অতি অখাদ্য, কেউ খায় নাকি? রাজা শুনে অবাক। বললেন, এই তো সেদিন তুমি বেগুনের এত সুখ্যাতি করছিলে, আর আজ উল্টো কথা বলছ? গোপাল বলল, মহারাজ, আমি আপনার চামচা, বেগুনের তো নই!

এইসব প্রতিবাদীরা আদতে তাই। যে আন্তর্জাতিক জেহাদি চক্রের এরা চামচা তাদের আঙ্গুলিহেলনে এরা পুতুলনাচের পুতুলের মতো লাফায়, প্রতিবাদের নাটক করে। এরা ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলে মানতে চায় না। কিন্তু ধর্ষণের অভিযোগ তোলার সময় প্ল্যাকার্ডে লিখছে 'হিন্দুস্তান, আমি লজ্জিত'। দেবদেবীদের নিয়ে এরা কুশ্রী উক্তি করে, কিন্তু ধর্ষণের স্থান উল্লেখ করতে গিয়ে এরা মন্দিরকে বলছে "দেবীস্থান"। কেন? হিন্দুদের খোঁচা দেওয়াটাই কি এদের আসল উদ্দেশ্য? তা নাহলে ধর্ষিতা ও ধর্ষকের ধর্ম নিয়ে এদের এত মাথাব্যথা কেন? প্রশ্নটা এখন আর কে ধর্ষক, কে নির্দোষ— সেটাতে আবদ্ধ নেই। এই ঘটনাটাকে ব্যবহার করে অনেকেই আজ হিন্দুধর্মকে ধর্ষকের ধর্ম প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

তাপসী মালিকের জন্য যারা সিবিআই তদন্তের দাবি করেছিল, আজ তারা সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করছে কেন? মন্দিরে ধর্ষণ

হলে সেটা হিন্দুধর্মের দোষ, আর মসজিদে ধর্ষণ হলে 'অপরাধের কোনো জাত হয় না', এটা কী ধরনের দ্বিচারিতা? অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত, তা সে যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। অভিযুক্তরা যদি সত্যিই মন্দিরের ভেতর ধর্ষণ করে থাকে, তবে তাদের শুধু প্রাণদণ্ডই নয়, তার আগে তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে বহিষ্কারও করা উচিত। সেটাই আমাদের সংস্কৃতি আমাদের শিখিয়েছে। আসিফার জন্য ন্যায়বিচার আমাদের সবার দাবি। কিন্তু সে ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ তদন্ত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভুলভাল লোককে ফাঁসালে চলবে না, আসল লোকটাকে ধরতে হবে। সেটা আদৌ হচ্ছে কি? সন্দেহটা সেখানেই জাগছে।

এই ধরনের ঘটনায় ধর্ষিতার নাম বা ছবি মিডিয়া কখনোই দেখায় না। দেখানো উচিতও নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মিডিয়া আসিফার ছবি ও নাম শুধু প্রকাশ নয়, জোরগলার প্রচার করতেও দ্বিধা করেনি। কেন এই ব্যতিক্রম? সবচেয়ে বড়ো কথা, ঘটনাটা ঘটেছিল এবছরের জানুয়ারি মাসে, তখন কিন্তু ঘটনাটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। হঠাৎ তিনমাস পর এই এপ্রিল মাসে ঘটনাটা নিয়ে মিডিয়া চর্চা শুরু করল, বলিউড প্রতিবাদে নামল। কেন বলুন তো? কেন ঘটনাটা জানুয়ারি মাসে প্রচারের যোগ্য ছিল না, আর এপ্রিল মাসে সেই একই ঘটনা এরকম প্রচারের যোগ্য হয়ে উঠল? জানুয়ারি আর এপ্রিলের মধ্যে একটা বড় তফাত ঘটেছে। এর মধ্যে আসিফার মৃত্যুর চার্জশিট সম্ভবত বদলে গেছে। আসিফার মৃত্যুর প্রাথমিক তদন্ত করেছিল জম্মুর পুলিশ। তারা বলেছিল, এটা ধর্ষণ নয়, শুধুই হত্যা। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল একটি মুসলিম ছেলে (সম্ভবত রোহিঙ্গা সে)। সেই ছেলেটি তার অপরাধ স্বীকারও করেছিল। বলেছিল, আসিফা ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ও আসিফাকে খুন করেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল জঙ্গলের মধ্যে। এই সময় আসরে নামেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। হুরিয়ত নেতা জিলানীর পরামর্শে তারই মনোনীত কাশ্মীর পুলিশদের দিয়ে উনি একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেন। সেই দলের চার্জশিট, অর্থাৎ দ্বিতীয় চার্জশিট প্রথম চার্জশিট থেকে পুরোপুরি আলাদা। সেই দ্বিতীয় চার্জশিট, যার ভিত্তিতে এত প্রচার চলছে, তার মধ্যে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যাপার রয়েছে। চার্জশিটে তিনটে বিষয়কে প্রধানভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, নির্যাতিতা মুসলিম। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত হিন্দু। তৃতীয়ত, ঘটনাটা ঘটেছে মন্দিরে। সাধারণত চার্জশিটে এভাবে সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গল রাখা হয় না। এটা ভারতীয় পুলিশের পরম্পরার বিরোধী। আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আসিফার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। সে রিপোর্ট বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছিল এটা হত্যার ঘটনা, ধর্ষণ নয়। কাশ্মীরি তদন্তকারী দল আসার পর এটাকে ধর্ষণ করে খুন বানিয়ে দেওয়া হলো। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তো লাশের ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে লেখা হয়। সেটা কী করে বদলে যায়? অভিযুক্ত যে হিন্দু যুবক ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের ওপর অভিযোগের মূল ভিত্তি একটাই, আসিফার মৃতদেহ পাওয়া গেছে ওই যুবকের বাড়ির সামনের একটা মন্দির থেকে। বাড়ির সামনে থেকে লাশ পাওয়া গেছে বলে তাকে অভিযুক্ত করাটা অনেকটা হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্রের বিচারের মতো লাগছে না? যে মন্দির থেকে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেই মন্দিরে আশেপাশের আটটা গ্রামের মানুষ প্রতিদিন পুজো দেয়। ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে মন্দিরটা। এক কামরার ছোট্ট মন্দির, জানালায় কোনো কবাট নেই, দরজাও তারজালির তৈরি। মন্দিরের ভেতরের কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সারাক্ষণ কেউ না কেউ মন্দিরে আসা যাওয়া করে। এর ওপর মকর সংক্রান্তির দিন ওই মন্দিরে উৎসব হয়েছিল, যে উৎসবে যোগ দিতে শতাধিক লোক মন্দিরে জমায়েত হয়েছিল। এদের সবার নজর এড়িয়ে মন্দিরের মধ্যে আসিফাকে বন্দি করে রাখা, এতগুলো লোক মিলে বারবার ধর্ষণ করা কি আদৌ সম্ভব? আশেপাশের কেউ কিছু দেখতে পেলো না, কোনও শব্দ শুনতে পেলো না? এতগুলো লোক বদ উদ্দেশ্যে মন্দিরে যাতায়াত করছে, আশেপাশের কেউ তা খেয়াল করল না?

কাশ্মীর ক্রাইম ব্রাঞ্চের এই দু'নম্বর চার্জশিটে বেশ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছে, অপরাধটা কী করে করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিবরণের ভিত্তি কী? সেটা কিন্তু কোথাও দেখছি না। অভিযুক্তরা সবাই দোষ অস্বীকার করেছে। তার মানে তারা নিশ্চয়ই এসব কথা বলেনি। কোত্থেকে জানল পুলিশ এসব কথা? চার্জশিটের সবকিছু একটা মনগড়া কাহিনি নয় তো? স্বীকারোক্তি ছাড়া, প্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ কিন্তু কোর্টে ধোপে টিকবে না।

কাশ্মীর পুলিশের যে দলটি দ্বিতীয় চার্জশিট দাখিল করেছে, তাদের সম্পর্কেও বেশ কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দলের প্রধান নিজেই অন্য এক ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত। এরকম লোক কী করে এই তদন্তের দায়িত্ব পেল? সে লোকটি আবার হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতাদের খুবই প্রিয়জন। হুরিয়ত কনফারেন্সের ঘোষিত লক্ষ্য, জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করা। তদন্তকারী দলের এই প্রধান কি সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করছে? মিডিয়া প্রচার করেছিল, হিন্দুদের ভয়ে আসিফার পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। তদন্তের নামে কাশ্মীর পুলিশের লাগাতার অত্যাচারে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীর আগেই হিন্দুশূন্য হয়েছে, হয়তো এইভাবে জম্মুও হিন্দুশূন্য হবে। তারপর রাজ্যটা আদৌ ভারতবর্ষে থাকবে তো?

আমি জানি না, সত্যিটা কি। অনেকরকম পরস্পরবিরোধী প্রচার চলছে বাজারে। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল কেউ জানে না। আমরা কেউ তো আর কাঠুয়ায় যাই না। যে বাজারি সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিন মিথ্যের বেসাতি করে, তাদের খবরে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। আজ তাই অনেকেই বিভ্রান্ত। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যে কেউই নিরপেক্ষভাবে ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করবে, তার মনে অসংখ্য সন্দেহের উদ্রেক হতে বাধ্য। ঘটনাটা যেরকম দেখাচ্ছে, হয়তো সত্যিই সেরকম নয়। এই সম্ভাবনাটাকে অস্বীকার করা যায় কি?

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যার মানে হল, যদি কাউকে মারতে চাও, তাহলে আগে তাকে লোকসমক্ষে বদনাম করে দাও। বিশেষ করে তার নিজের লোকেদের কাছে। আর হিন্দুদের কাছে সবচেয়ে বড় বদনাম হল, ধর্ষণের বদনাম। যদি কোনও মন্দির ভাঙতে হয়, তবে সেই মন্দিরে ধর্ষণ হয়েছে এমনটা রটিয়ে দাও। হিন্দুরা নিজেরাই সে মন্দির ছেড়ে চলে যাবে। এটা অরওঙ্গজেবের যুগে যতটা সত্যি ছিল, ততটাই আজকের যুগেও সত্যি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ধর্ষণ সম্বন্ধে এমন মনোভাব কিন্তু পৃথিবীর সব সমাজে নেই। আইসিসের রাজত্বে বিধর্মী নারীদের ধর্ষণকে রীমিতো পুণ্যকর্ম বলে মানা হয়। শুধু মাসুল বা রাক্কায় নয়, মিশরের মতো মডারেট ইসলামিক দেশগুলোতেও খেলার ছলে ধর্ষণ হয়। সে খেলার নাম 'তাহারুষ'। তাহারুষের শিকার কোনও মেয়ে বিচার চাইতে পারে না। বিচার চাইলে উল্টে দোষ মেয়েটির ওপর পড়ে। সে মেয়ের ওপর ব্যভিচারের মোকদ্দমা চালানো হতে পারে, যার শাস্তি চৌরাস্তার মোড়ে

দাঁড় করিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা।

শুনলাম, আসিফার পরিবার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে। কাশ্মীর ক্রাইম ব্রাঞ্চের এই গোলমেলে তদন্তে তাদেরও আস্থা নেই। তারা তাদের মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি চায় না। মেয়ে যাতে সুবিচার পায়, এটুকুই চায়। আর সেই দাবিই কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের হিন্দু নেতারাও করেছে। অথচ মিডিয়া সেটাকেই এমনভাবে প্রচার করছে, যার মানে দাঁড়ায়, হিন্দু নেতারা ধর্ষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এখানেও সন্দেহ জাগে, মিডিয়ার উদ্দেশ্যটা কি? আসিফার জন্য ন্যায়বিচার, নাকি অন্য কিছু? দেখা যাচ্ছে, দেশের অনেকেই সুবিচার চায় না। তারা চায়, এই সুযোগে হিন্দুদের বদনাম দিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দিতে।

বড্ড কষ্টে আছি আজ। যে ধর্ম বঙ্কিম থেকে শরৎ, সারদা থেকে নিবেদিতা, বিবেকানন্দ থেকে অরবিন্দ, মাতঙ্গিনী থেকে প্রীতিলতা—এত মহামানবের জন্ম দিয়েছে যুগে যুগে, আজ তাকে রাস্তায় নামিয়ে অপমানিত কলঙ্কিত করা হচ্ছে একতরফা অভিযোগে, বিনা বিচারে। আমাদের ধর্ম শক্তি-উপাসনার ধর্ম। আর আমাদের ধর্মের ওপর উঠছে ধর্ষকের অপবাদ? আজও আমরা এই দেশে সংখ্যাগুরু, তবু এই অবস্থা। যদি কোনোদিন সংখ্যালঘু হয়ে যাই, সেদিন কী হবে? যেদিন ঘটনাটা প্রচার হল, তার পরদিনই ইন্টারনেট জুড়ে অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্র ছড়িয়ে পড়ল। কোথাও বিষ্ণুকে ধর্ষণকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে, কোথাও বা শিবের ত্রিশূলকে ধর্ষকের রক্তাক্ত পুরুষাঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে, মা দুর্গা ভীত, তাঁর ভক্তরা তাঁকে ধর্ষণ করবে। শিউরে উঠতে হয় এগুলো দেখে। তারা কীধরনের বিকৃত রুচির মানুষ, যারা এইসব ব্যঙ্গচিত্রের পরিকল্পনা করেছে? এই সব ব্যঙ্গচিত্রই পেশাদার হাতে আঁকা। শুধু তাই নয়, এর কয়েকদিনের মধ্যেই বিদেশি এয়ারপোর্টে একাধিক লোককে দেখা গেল স্লোগান লেখা টিশার্ট পরনে। স্লোগানের মর্মার্থ, ভারত ধর্ষকের দেশ। ওখানে বেড়াতে যাবেন না, ওখানে নিজের মেয়েদের পাঠাবেন না। মেয়েরা ভারতে নিরাপদ নয়। কোনও সংগঠিত অর্থবান বিশ্বব্যাপী শক্তি এর পেছনে না থাকলে কি এসব এত তাড়াতাড়ি সম্ভব?

'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তকমা এঁটে স্বামী অসীমানন্দ, সাধ্বী প্রজ্ঞা ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুরোহিতকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিতকে ভিলেন বানিয়ে তো বলিউড সিনেমাও হয়েছে। আর আজ তাঁরা কোর্ট থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। সেদিন যারা হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসীর লেবেল লাগিয়েছিল, তাদের কি ক্ষমা চাইতে দেখেছেন? দিল্লিতে চার্চ আক্রান্ত হলে, সেটা হিন্দুদের দোষ। পরে জানা গেল, সেটা নিছক ছিঁচকে চুরি। রানাঘাটে কনভেন্ট আক্রান্ত হলে, সেটাও পড়ল আমাদেরই ঘাড়ে। পরে জানা গেল, আক্রমণকারীরা সবাই বাংলাদেশি ডাকাত। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা নিয়ে মোদীকে কাঠগড়ায় তোলা হল। পরে জানা গেল, ভেমুলা নিজের সুইসাইড নোটে নিজের সঙ্গীসাথীদেরই দোষী ঠাউরেছিল। চণ্ডীগড়ে ট্রেনে বচসাকে কেন্দ্র করে এক মুসলিম যুবক মারা গেল। মিডিয়া বলল, গোমাংস বহনের অপরাধে নাকি ছেলেটাকে হিন্দুত্ববাদীরা খুন করেছে। এক বছর মামলা চলার পর পর কোর্টে প্রমাণ হয়েছে, গোমাংস বা ধর্মীয় কারণে নয়, ট্রেনের সিট নিয়ে ঝগড়ার কারণেই এই ঘটনা, আর ঝগড়াটা ওই ছেলেটিই বাধিয়েছিল। প্রত্যেকবার ভোটের আগে এসব কাণ্ড শুরু হয়। ভোটের পর থিতিয়ে যায়। কাঠুয়ার ঘটনাটার ক্ষেত্রেও কি সেরকমই ঘটতে চলেছে? মিডিয়া ট্রায়ালে বারবার হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, প্রতিবার সে অভিযোগ কোর্টে মিথ্যে প্রমাণ হবার পরেও কিন্তু অভিযোগকারীরা ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে না। করবেও না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এই তো সবে শুরু। তৈরি থাকুন, ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে একের পর এক মরণকামড় দিয়ে যাবে ওরা। আন্তর্জাতিক জেহাদি চক্র, ওপাস ডেই, ভ্যাটিকান, কম্যুনিস্ট, নকশাল, পাকিস্তান, চিন, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা—সবাই মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাবে এবার। একের পর এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠবে, যার কোনোটাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হবে না, কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যাবে। যারা ষাট বছর ধরে দেশটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল, তারা কি আর এত সহজে হার মানবে?

আসিফা-কাণ্ডকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা বন্ধ হোক। শুধু আসিফা নয়, ওর মতো যত মেয়ে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা সবাই সমানভাবে ন্যায়বিচার পাক। হিন্দু বলে তারা যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না থাকে।

মা-বোনেদের একটা কথা বলতে চাই। সমাজের এই পিশাচগুলোর থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের পুরুষদের নেই। আর নারীকে নিজের নিরাপত্তার জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে, এটা কে বলেছে? তাই তুমি পূজাই হও বা আসিফা, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। কারাটে শেখো, বক্সিং শেখো। সঙ্গে অস্ত্র রাখো, লঙ্কাগুঁড়ো রাখো। সজাগ থাকো, অচেনা লোককে বিশ্বাস কোরো না। প্রতিটি নাবালিকার সঙ্গে সাবালিকা কারোর সবসময় থাকা জরুরি। দল বেঁধে চলাফেরা করো। তোমরা সবাই মা দুর্গার শক্তির অংশ। সেই শক্তিকে জাগাও। তখন কোনও অসুরের সাধ্য কি, তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে? প্রতিটি ধর্ষক, প্রতিটি ইভটিজারের চরম দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠুক তোমাদের সংঘবদ্ধ শক্তি। তারপর দ্যাখো, সমাজ বদলায় কিনা।

আমি চাই, মেয়েদের আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিক। মেয়েদের স্কুলে মার্শাল আর্ট বাধ্যতামূলক হোক। পুলিশ সার্ভিসে পঞ্চাশ শতাংশ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত হোক। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়ে কাঠুয়ার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। সত্যিকারের দোষীদের দ্রুত সাজা হোক। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা বন্ধ হোক। আর শুধু আসিফা নয়, ওর মতো আর যত মেয়ে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা সবাই সমানভাবে ন্যায়বিচার পাক। হিন্দু বলে তারা যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না থাকে। এই দাবিগুলো করা কি অন্যায়?

[লেখক অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী]

শ্রীশ্রী কান্তজীউর অতীতের মন্দির (ইং ১৭০৪)।

দিনাজপুরের শ্রীশ্রীকান্তজীউ এবং সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর নয়, বাংলাদেশের দিনাজপুর। ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দিনাজপুর বিভাজিত হয়ে এক অংশ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে এবং অপর অংশ দিনাজপুর নামে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমানে বাংলাদেশের একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তে পুনর্ভবা ও ঢেপা নদীর সংযোগস্থলে এর অবস্থিতি। কান্তজীর মন্দির দিনাজপুর তথা বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যশিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। এই বিখ্যাত মন্দির দর্শনার্থে শ্রদ্ধেয় রমেন নন্দীর পরিচিত অর্চনা রায়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে আমি, আমার স্ত্রী অতসী ও মেয়ে প্রিয়াংকা সম্প্রতি রাত্রে বারাসাত থেকে বাসে রওয়ানা হই। পরদিন সকালে বালুরঘাট পৌঁছে বাস বদল করে হিলি চেকপোস্টে পৌঁছে প্রথমে ভারত ও পরে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশান অফিসের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নিলাম। হিলি থেকে বাসে প্রায় দুপুর ১টায় দিনাজপুর পৌঁছলাম। এবং অর্চনা রায়ের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করি। তাঁর স্বামী সন্তোষ রায় এবং ছেলে জয় ও মেয়ে জয়া আমাদেরকে তাদের পরিবারের একজন করে নেয়।

প্রায় বিকেলে জয়কে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি। খুব সাজানো গুছানো শহর তো নয়ই। পরিকল্পিতভাবেও শহর গড়ে ওঠেনি। নালা নর্দমা নেই বললেই চলে। ঘিঞ্জি এলাকা। রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত। যানবাহন বলতে বাসের সংখ্যা বেশি। মাছ, আনাজপাতি কাপড় সাংসারিক দ্রব্যাদি, শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এখানে চাল, গম, পাট, ভুট্টা ও কৃষিজ ফলন বেশি হলেও তুলনামূলকভাবে দামও বেশি। এই দিনাজপুর ছিল সেন রাজাদের আমলে পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে একে সবুজ শস্যের দেশ বলা হয়। এর নামকরণ নিয়ে একটি প্রবাদ কাহিনি রয়েছে। এই জনপদে 'দিনাজ' নামে এক রাখাল ছিল। ভাগ্যক্রমে এক সময় এই রাখাল রাজত্ব পেয়ে রাজা হলে তার নামেই নামকরণ হয় 'দিনাজপুর'। সেদিনের মতো সন্ধ্যেয় অর্চনা দেবীর বাসভবনে ফিরে আসি আমরা। এবং পরদিন সকালবেলা অটোয় চেপে কান্তনগরে কান্তজীর মন্দিরের উদ্দেশে রওয়ানা হই। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৮ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত কান্তনগর গ্রামে তিনশত বছরেরও বেশি সময়ের প্রাচীন টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ কান্তজীর মন্দির আজও অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। মূলমন্দিরের বহির্গাত্রের দোচালা বিশিষ্ট ২৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট প্রশস্ত প্রাচীর যা মন্দিরটাকে সুরক্ষা করছে। তাতেও অনেকগুলো ঘর দরজা জানালাবিহীন অযত্নে অবহেলায় পতিত অবস্থায় রয়েছে। তবে পূর্বদিকের ঘরগুলি মন্দিরের অফিস ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রন্ধনশালা ও প্রসাদ বিতরণের ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উন্মুক্ত খোলামেলা পরিসরে ত্রিতল বিশিষ্ট রক্তিম বর্ণের কান্তজীর মন্দিরটি পাথরের বেদীর উপর স্থাপিত রয়েছে। আর তার চার দেয়াল সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চার যুগের পৌরাণিক কাহিনির বর্ণনায় চিত্রিত রক্তবর্ণের পোড়ামাটির ফলকে আবৃত রয়েছে। সেইসব খণ্ড খণ্ড ফলকে পৌরাণিক ঘটনাবলী যেমন রামায়ণ, মহাভারত আর কৃষ্ণলীলার চিত্র রয়েছে। তেমনি তারই পাশাপাশি ফল, লতাপাতা, পশুপাখি ও জ্যামিতিক নকশাগুলি সত্যিই প্রাচীন স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন যা মনে দাগ কাটার মতো। এ তো না দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না। কত নিষ্ঠার সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীরা মন্দিরটির কারুকার্য সম্পন্ন করেছে। মন্দিরের উত্তর দিকের গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি রয়েছে যার বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'রাজা প্রাণনাথ অতি মধুর প্রাসাদতুল্য সুরচিত মনোরম নবরত্ন চূড়া বিশিষ্ট শ্রী শ্রী কান্তজীউ মন্দিরটি নির্মাণ শুরু করেন। পিতার সংকল্প সিদ্ধির জন্য রাজা রামনাথ শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে এই মন্দিরটির নাম কান্তজীউ মন্দির রেখে সংকল্প সমাপ্ত করেন। বেদ অবধিকাল ক্ষিতি শকাব্দে"। শিলালিপি পড়ে কেমন যেন খটকা লাগলো। মন্দিরের তৈরির সময়কার নবরত্ন অর্থাৎ নয়টি চূড়ার একটিও বাস্তবে দেখতে পেলাম না। মন্দিরে উপস্থিত স্থানীয় কয়েকজন বয়োবৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম মন্দিরের একতলার ছাদের চারটি চূড়া, দ্বিতলের ছাদের চারটি চূড়া এবং তৃতীয়তলের চূড়াটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দুষ্কৃতকারীরা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা ইতস্তত করে জবাব দিলেন, অতীতে কোনও এক সময় ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে বলেই তাঁরা শুনেছে। অথচ, কী আশ্চর্য মন্দিরের ভিত্তি, দেওয়াল এবং পোড়ামাটির ফলকগুলোর সামান্য ক্ষতি হলো না এ কেমন কথা। শুধুমাত্র চূড়াগুলি ভাঙল? জানতে চাইলে তারা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। আবার ১৯৭১ সালে দুর্বৃত্ত কর্তৃক ভাঙার কথা বললে তারা কেমন যেন সত্য ঘটনাটা লুকোতে চাইল। যাই হোক, মন্দিরে কোনও বিগ্রহ স্থাপিত দেখতে পেলাম না। তখন তারা বলে যে, '৭১ সালে নাকি প্রাচীন কান্তজীউর মূল্যবান কষ্টিপাথরের মূর্তি এবং মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারাদি দুষ্কৃতকারীরা লুট করে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে চূড়াবিহীন মন্দিরটা বিগ্রহহীন অবস্থায় অরক্ষিতই ছিল অনেকদিন। পরবর্তী

সময়ে ১৯৭৪ সালে হিন্দু ধর্মপ্রাণ জনগণের আবেদনক্রমে বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় নতুন বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। তবে এই বিগ্রহটিও চুরি যাওয়ার ভয়ে নিত্য পূজার সময়ে এবং বিশেষ বিশেষ পার্বণে মন্দিরের অস্থায়ী আসনে রাখা হয়। আর পূজা শেষে অফিস ঘরের সুরক্ষিত স্থানে রেখে আসা হয়। এই প্রাচীন অপরূপ সুন্দর মন্দিরটি দিনাজপুরের রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রাণনাথ এই কান্তনগরে (অতীতের শ্যাম গড়) নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি জীবদ্দশায় মন্দিরটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নাই। তবে ১৭৫২ সালে তাঁর দত্তক পুত্র রাজা রামনাথ মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করেন। এবং মন্দিরটির নামকরণ করেন, 'কান্তজীউর মন্দির'। আর এই কান্তজীর নামানুসারে গ্রামটির নামও রাখা হয় 'কান্তনগর'। মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল এক ধর্মপ্রাণ ব্রহ্মচারী কাশীনাথ ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তিতে। পরবর্তীকালে কাশীনাথ ঠাকুরের প্রধান শিষ্য শ্রীমন্ত ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হন। শ্রীমন্তের একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিয়ে করেন রংপুরের রাজপুত্র হরিরাম। তাদের পুত্র শুকদেবের প্রথম স্ত্রীর দুই সন্তান রামদেব ও জয়দেবের (রাজত্বকাল ১৬৭৭ খ্রি:-১৬৮২ খ্রি:) মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান প্রাণনাথ (রাজত্বকাল ১৬৮২ খ্রি:-১৭২২ খ্রি:) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই প্রাণনাথ একসময় বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরুক্মিণী কান্ত মন্দিরের বিগ্রহের অনুরূপ একটি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সংগ্রহ করে দিনাজপুরে ফিরে আসেন। এবং এই কান্ত নগরে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করে বিগ্রহ স্থাপন করেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটি রাজবাটিতে নিয়ে গিয়ে পূজার্চনা করবেন। আর তাই ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে নদীপথে বাদ্যবাজনা সহকারে দিনাজপুরের রাজবাড়ির মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুনরায় কান্ত নগরের মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে।

ততক্ষণে সূর্যদেব মাথার উপর প্রখর রৌদ্র ছড়াচ্ছে। আমরা একটু হতাশ হলাম। মন্দিরে বিগ্রহ দেখতে পেলাম না বলে। আর অমনি হঠাৎ করে শাঁখ ও উলুধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ চঞ্চল হয়ে উঠে। মন্দিরের পূর্বপাশে অফিস ঘরের দিক থেকে দু'জন পুরোহিত রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ দু'জন ছত্রধারী সহকারে মন্দিরে এনে সামনের বারান্দায় কাঠের আসনে স্থাপন করেন। অর্থাৎ প্রাত্যহিক পূজা শুরু হবে। আমরা প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করি। লক্ষ্য করলাম পূজা শেষে আবার রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ অফিস ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, রাধাকৃষ্ণবিহীন মন্দির শূন্য পড়ে রইল। একটু পরেই আমরা অফিসঘরের সামনে কান্তজীর পূজার অন্নভোগ প্রসাদ পেলাম। দর্শনার্থীও তেমন একটা নেই। হাতে গোনা ১৫।২০ জন হবে। বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর প্রাচীন এই মন্দির দর্শন করতে বিভিন্ন সময়ে দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটক কান্তনগরে আসেন। প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসলীলা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে রাসের মেলা। আবার জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের স্নান উৎসব হয়। পূণ্যার্থীরা শ্রীকৃষ্ণকে ১০৮ ঘটি জল দিয়ে স্নান করানোর পুণ্যময় দৃশ্য উপভোগ করে থাকেন। মন্দিরের উত্তর চত্বরে একটি তমাল বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই স্থলের আদি প্রাচীন বৃক্ষটি আর নেই। মন্দিরের পূর্বপাশে রয়েছে দোল বেদী। এই বেদীকে ঘিরে প্রতিবছর দোল উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এবং পশ্চিম পাশে রয়েছে রাসবেদী। তার সামান্য উত্তরে একটি দীঘি ছিল যা 'কন্যা ডুবি' নামে পরিচিত। বর্তমানে এই দিঘিটি ভরাট হয়ে তাতে চাষ আবাদ করা হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিব মন্দিরও রয়েছে। তাতে স্থাপিত হয়েছে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। প্রতিবছর মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ তিথিতে শিবরাত্রি ব্রত পালিত হয়।

১৯৫২ সালে দিনাজপুর রাজবংশের সর্বশেষ রাজা জগদীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর রাজবাড়ি ও সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। দেশত্যাগ আর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরবর্তীকালে স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কান্তজীউর মন্দিরটি রাজ দেবোত্তর এস্টেটের এজেন্ট কর্তৃক বর্তমানে পরিচালিত হয়ে চলেছে।

কান্তজীকে প্রণতি জানিয়ে আমরা প্রায় বিকেলে অর্চনা দেবীভবনে ফিরে আসি। সারা দিনের মন্দির দর্শনের ক্লান্তিতে রাতটুকু কেটে গেল।

শ্রীশ্রী কান্তজীউর বর্তমান মন্দির (ইং ২০১৭)।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ জুলাই '১৭ তারিখে আমরা সকাল ১০টায় রাজবাড়ি দেখার জন্য রওয়ানা হয়ে যাই। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ কি. মি. উত্তর পূর্বদিকে এর অবস্থিতি। রাজবাড়িতে রয়েছে একটি কৃষ্ণ মন্দির আর আয়না মহল, রানি মহল ও ঠাকুরবাড়ি মহল। আজ আর রাজবাড়ির অতীতের ঐতিহ্য নেই। যা ছিল দু'শো বিঘারও বেশি জমি নিয়ে চারশত বছরের পুরনো রাজবংশের গড়া রাজবাড়ি, আজ তার প্রায় সকল জমিই সাধারণের দখলে বেহাত হয়ে গেছে। রাজবাড়ি দেখে নিয়ে দিনাজপুর শহরে পৌঁছাবার ৬ কি. মি. আগে তাজহাট গ্রামে ''রাম সাগর'' দিঘি পৌঁছালাম। যদিও এটি সাগর নয়। নামে সাগরে হলেও সুবিশাল এই ''রামদীঘি'' ১৯৫২ খ্রি: মহারাজা রামনাথ রায় এটি খনন করিয়েছিলেন প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণার্থে। তাছাড়া আরো কয়েকটা মন্দির দর্শন করেছি যেমন, শুকো মন্দির, রসিকজিউ মন্দির, কালিয়া জীউর মন্দির ইত্যাদি। পরিশেষে দিনাজপুর শহরের থানার পেছনে একটি প্রাচীন কালীকা মায়ের মন্দির ''মোসান কালী'' বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। তখন মায়ের মন্দিরে সান্ধ্য আরতি চলছিল। এই কালিকা মা অতি জাগ্রত দেবী। প্রবাদ আছে প্রাচীন কালে মায়ের মন্দিরে ডাকাতেরা নরবলি দিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করে ডাকাতি করতে বেরত। এখন আর নরবলি প্রথা নেই। তবে পশুবলি প্রথার প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় হিন্দুরা মায়ের মন্দিরে মনস্কামনা পূরণার্থে পূজা দিয়ে থাকেন। আমরা মায়ের রাতুল চরণে প্রণতি জানিয়ে সেদিনের মতো ফিরে এসে রাতটুকু সুনিদ্রায় কাটিয়ে দিলাম।

এই সময়

কোকেন

রাশিয়ায় বিয়র কেনা বেশ ঝক্কির কাজ। কিন্তু কোকেন সহজেই পাওয়া যায়। রাশিয়ার আইন

অনুযায়ী প্রকাশ্যে কোকেন সেবন কোনও অপরাধও নয়। শর্ত একটাই, সঙ্গে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন থাকতে হবে। কোন ডাক্তার কোকেন-হেরোইন খাবার পরামর্শ দেন ভগবানই জানেন।

হিটলারিয়ানা

বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না, এটা সাধারণ ঘটনা। তার জন্য বাবা-মাকে অনেক

সাধ্যসাধনা করতে হয়। কিন্তু চীনের এক বাবা যা করেছেন তা করার কথা খুব কমজনই ভাবতে পারেন। তিনি তার মেয়েকে বাইকের পিছনের সিটে বেঁধে স্কুলে নিয়ে গেছেন। মেয়েটির কান্নায় অবাক সারা বিশ্ব।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে

একেই বোধহয় বলে দুটি হৃদয়ের মিলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক চীন

সফরে সে দেশের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। চীনের হুবেই প্রাদেশিক জাদুঘরে দুই রাষ্ট্রপ্রধান একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ -সমাচার

দিল্লিতে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজ গত ২২ এপ্রিল দিল্লিতে জেএনইউ কনভেনশন সেন্টারে বর্ষবরণ উৎসব (১৪২৫) উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায়, আর এস এসের সর্বভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী করুণা প্রকাশ, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, স্বামী ঋতপ্রকাশ আরণ্য, মল্লিকা নাড্ডা, অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

অদ্বৈত চরণ দত্ত বলেন, কেবল কানহাইয়ার মতন দেশদ্রোহী কি জে এন ইউতে তৈরি করা হবে? আমরা কি কখনও স্বামী বিবেকানন্দ বা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর মতন মানুষ তৈরি করতে পারব না? আমাদের দেশের জন্য

কাজ করা উচিত। আমাদের ইতিহাসে অখণ্ড ভারতের কোনও উল্লেখ নেই। আমাদের বাস্তব ইতিহাস জানা দরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিবেক দেবরায় বলেন, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গর্বিত বোধ করি। কিন্তু জেএনইউ বার বার ভারতীয় ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করে। এই স্থানটিকে দেখলে মনে হয় যে এটা একটি আলাদা রকমের জায়গা। এর পরিবর্তন যত দ্রুত সম্ভব হওয়া উচিত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী করুণা প্রকাশ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুব বেদনাপূর্ণ। আমাদের সবার উচিত সবাইকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের হিন্দুদের জন্য একসঙ্গে কাজ করা। আমরা গর্বিত যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ অনেকে মনীষীর জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে এবং কীভাবে ওখানকার হিন্দুরা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে, আমাদের সেটা করা উচিত।

অনুষ্ঠানে স্বামী ঋতপ্রকাশ বলেন যে নিজের যথার্থ সত্তাকে জানাটা খুবই জরুরি। উপনিষদের কথা প্রসঙ্গ তুলে তিনি শুদ্ধ চিন্তনের দ্বারা শুদ্ধ মননের কথা বলেন। "ইন্দ্রিয় দ্বারা আনীত বিষয় শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সাত্ত্বিক অনুভূতিটা খুব জরুরি। নববর্ষে এমন সংকল্প নিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।" বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। তাতে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হচ্ছে। সেইসঙ্গে নষ্ট হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা বা সিকিউরিটি। বর্তমানে এখানে তালিবানি শাসন চলছে। এই সঙ্কটময়

এই সময়

মানবিক

ভারতীয় সেনা আরও একবার প্রমাণ করল তাঁদের হাতে অস্ত্র থাকলেও তাঁরা জহ্লাদ নন।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা একটি বারো বছরের কিশোর ভুল করে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছে সেনা।

চাকরি প্রসঙ্গে

দেশে কত চাকরি তৈরি হলো জানা যায় পে রোল রিপোর্টিং থেকে। সম্প্রতি পে রোল

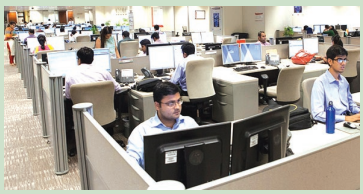

রিপোর্টিং প্রকাশিত হয়েছে। নীতি আয়োগকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩৫.৩ লক্ষ চাকরি তৈরি হয়েছে।

তীর্থযাত্রায় চিকিৎসক

কেদারনাথ মন্দিরের দরজা তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের যাতে

কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্য সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দীর্ঘযাত্রায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সাহায্য করার জন্য এবার পাওয়া যাবে চিকিৎসক। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও।

সমাবেশ -সমাচার

পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে এসে এই পরিস্থিতির বিরোধ করে অশুভ শক্তিকে নিঃশেষ করতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জন্ম হয়েছিল হিন্দুদের জন্যই। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ধর্মগুরুরা যেভাবে অতিরিক্ত অহঙ্কার করে নিজেরাই রাজ্য চালানোর কথা বলে সেরকম ভারতের ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি।

সিউড়িতে বসুন্ধরা দিবস

গত ২২ এপ্রিল আর্থ ডে উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬ টায় সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লী আদি সর্বজনীন কালী মন্দির প্রাঙ্গণে বসুন্ধরা দিবসে এক দল স্কুল কলেজ পড়ুয়া দল বেঁধে ফুল দিয়ে আলপনা আঁকতে আঁকতে জানায় যে, আমরা চাই আমাদের বাসস্থান দূষণ মুক্ত হোক। স্কুল পড়ুয়া উর্মি সাহা, রিম্পা পাল, জয়তি চ্যাটার্জি বলে, আমরা চাই পৃথিবী প্লাস্টিক মুক্ত হোক। তার শপথ নিতে আমরা একজোট হয়েছি। আজ থেকে সংকল্প নিলাম প্লাস্টিক ব্যবহার করব না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন স্কুল শিক্ষিকা নিজেদের অর্থ থেকে সংসার খরচ বাঁচিয়ে সেই টাকায় গাছ লাগানোর শপথ নিলেন। শিক্ষিকা স্বাতী চ্যাটার্জী, মিঠু সাহা,

মৌমিতা বিষ্ণুরা বলেন, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে আলপনা দিয়ে বন্দনা জানালাম। সংকল্প করলাম আয়ের একটা অংশ দিয়ে আমরা নিজেদের শহরকে সবুজ করে তুলব।

বসুন্ধরা দিবসে ভূ-অলংকরণে ধরিত্রী বন্দনা শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলপনা, রঙ্গোলি, পুষ্প আলপনা, বৃক্ষে জল সিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে সংস্থার শিল্পীরা পরিবেশন করলেন বৃন্দ গান। প্রকৃতি রক্ষার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করেন অগণিত দর্শকমণ্ডলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী, শিক্ষক কল্যাণ ভট্টাচার্য, শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় ও পিন্টু কর্মকার বিশ্বজিত প্রমুখ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটা সংরক্ষণের উদ্যোগ

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটা ও পঞ্চরত্ন ইঁটের রাধাবল্লভ মন্দিরটি সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবি তুলল নিদর্শন সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। বাঁকুড়া সদর মহকুমাশাসক ও পৌরপ্রধান মহাশয়ের দপ্তরে তাদের তরফ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, বাঁকুড়ার গৌরবময় স্মারকগুলি বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এই সময়

প্রথম ইন্দু

ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আইনজীবী ইন্দু মালহোত্রা। তিনি দেশের প্রথম মহিলা আইনজীবী যাঁকে সর্বোচ্চ আদালতের

বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হলো। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে এম জোসেফ-সহ কলেজিয়ামের সকল সদস্য এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

গুরু-নিন্দা

মুসলমান জিহাদিরা অন্য ধর্মের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রায়শই অপমান করে থাকেন। সেই

ট্র্যাডিশন বজায় রাখলেন জামাত-উদ- দাওয়ার নেতা হাফিজ সইদের আত্মীয় আবদুল রহমান মাক্কি। সম্প্রতি তিনি অত্যন্ত কদর্য ভাষায় শিখ ধর্মের গুরু নানকদেবকে অপমান করেছেন।

মাথার ওপর ছাদ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে মধ্যপ্রদেশে তিন লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের গৃহহীন মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে খুশি। আবাস যোজনায় নাম নথিভুক্ত করার উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়েছে বলে সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

নববর্ষ আবাহন উৎসব

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত) পরিবেশিত একটি অনুষ্ঠানে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে উন্মোচিত হলো সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী । সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর এবারের বিষয় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর ভারতের প্রাচীন নগরী। লোকার্পণ করলেন প্রধান অতিথি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার সাধারণ সম্পাদক ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ

রাখলেন সংস্কার ভারতীর (পশ্চিমবঙ্গ) সভাপতি তপন গাঙ্গুলি। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় দেওয়ালপঞ্জীর প্রাক্‌কথন পর্বে এবারের দেওয়ালপঞ্জীর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে ষোড়শ মহাজনপদ-সহ দ্বারকা, পুরী, গয়া, কাশী, রাজগীর ইত্যাদি প্রাচীন জনপদের উল্লেখ রয়েছে যা এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান। উস্তাদ রাশিদ খান ও সত্যব্রত চক্রবর্তী উভয়েই সংস্কার ভারতীর কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এই কাজে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। এই সন্ধ্যায় উপস্থিতি ছিলেন সংস্কার ভারতীর শুভানুধ্যায়ী এবং পৃষ্ঠপোষক ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক পর্বে অনুষ্ঠিত হলো সমবেত সঙ্গীত ও স্বর্ণযুগের বাংলা গান। অংশগ্রহণে সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন শাখার শিল্পীবৃন্দ। উদ্বোধনী ভাবসঙ্গীত নৃত্য-সহ পরিবেশন করল বীরশিবপুর শাখা। বীরভূমের সিউড়ি শাখা পরিবেশন করল স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর স্মরণে নৃত্য-গীতি-আলেখ্য তেজোনিধি। স্বর্ণযুগের গান ও সমবেত সঙ্গীত পর্বের পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণে ছিলেন ধ্রুবজিত ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রুমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সবিতা দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস।

হাওড়াতে স্বাস্থ্য শিবির

খাদ্যাভাস ঠিকঠাক রাখলে অনেক রোগ ঠেকানো যায়। মানুষকে এ ব্যাপারে আরও সচেতন করতে হবে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি লাভদায়ক হতে পারে। ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনাসভায় এই মত উঠে এল। সম্প্রতি হাওড়ার শোহনলাল দেওরালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ড. সুশোভন পাল, অধ্যাপক শৈলেন্দ্র সিংহ, পবন শর্মা, স্বপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সেখানে একটি স্বাস্থ্য শিবিরও হয় যার আয়োজন করেন এলাকার স্বয়ংসেবক বলরাম পাঠক এবং দীপক দুবে। প্রায় ২০০ জন স্বাস্থ্যসেবা নেন।

সংবাদ জগতের আদি পুরুষ দেবর্ষি নারদ

জহরলাল পাল

পৌরাণিক মতানুসারে নারদ মুনি জগতের ঋষিদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে দেবর্ষি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনিই একমাত্র চরিত্র যাঁর উল্লেখ মোটামুটি সকল হিন্দু ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগেও দেবর্ষি নারদ দেব-দেবীর মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতেন। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র (সনক, সনন্দন, সনৎ, সনাতন, নারদ)-দের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মার বর লাভ করে তিনি আকাশ, পাতাল এবং পৃথিবী— এই তিন লোকে ভ্রমণের অধিকারী হন। তিনি দেবতা, সন্ত-মহাত্মা, ইন্দ্র আদি শাসক-সহ জনমানসের মধ্যে সহজ সংযোগের দ্বারা সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং তৎসঙ্গে প্রতিকারেরও প্রচেষ্টা চালাতেন। এইসব কারণে ঋষি নারদ দেবতা, দানব, মানব সকলের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে সৃষ্টির আদি সংবাদদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, সংবাদ আদান প্রদানে পটু তথা তৎপর, সমাজের জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, দেশ শাসনের ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত পরামর্শদাতা এবং নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ বিচারধারায় অনুপ্রাণিত ঋষি। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত থেকে কয়েকটি ঘটনার অবতারণা করা যেতেই পারে, যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, প্রতিটি ঘটনাই সংবাদ জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সাংবাদিকদের সর্ব প্রধান গুণ হওয়া উচিত প্রজ্ঞা। দেবর্ষি নারদ যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তা একটা ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। একদা এক ব্যাধ এক পক্ষী যুগলকে হত্যা করে। পক্ষীদ্বয় বাল্মীকি মুনির কোলে এসে পড়ে, এতে তিনি খুব ক্রোধিত হন। 'মা নিষাদ' বলে তার মুখ থেকে এক শ্লোক নির্গত হয়। কিন্তু বাল্মীকি পরে সেই শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হন। তখন ব্রহ্মা নারদকে বাল্মীকির নিকট প্রেরণ করেন। নারদ তখন শ্লোকের সূত্র অর্থ ব্যাখ্যা করে বাল্মীকিকে বুঝিয়ে দেন। এর পরেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করতে সমর্থ হন।

সাংবাদিকতার সর্ব প্রধান উপাদান হলো সংবাদ সংগ্রহ এবং সংবাদ প্রেরণ। আধুনিক কালের মতো পৌরাণিক কালে সংবাদ প্রচারের কোনও মাধ্যম না থাকায় সাংবাদিককে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়েই সংবাদ প্রদানে সচেষ্ট হতে হতো। দেবর্ষি নারদের এরূপ উদ্যোগের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখনীয়।

দেবতা ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করেন। তা থেকে দেবতারা অমৃত পান করেন। সকল দেবতারা সেখানে উপস্থিত থাকলেও মহাদেব এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তখন দেবর্ষি নারদ ব্যক্তিগত ভাবে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হয়ে সমুদ্র মন্থনের বিবরণ বিবৃত করেন। এতে মহাদেব খুব মর্মাহত হন। তখন দ্বিতীয় বার সমুদ্র মন্থন করা হয়। এবার অমৃতের পরিবর্তে গরল বেরিয়ে আসে। মহাদেব সেই গরল নিজ কণ্ঠে গ্রহণ করেছিলেন।

মহাদেবের সঙ্গে দক্ষ কন্যা সতীর বিবাহ হয়। কিন্তু দক্ষ মহাদেবকে পছন্দ করতেন না। এই জন্য দক্ষ তার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। যজ্ঞস্থলে সতী পতি নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ দেবর্ষি নারদ মহাদেব সমীপে নিবেদন করেন। তৎপর শিবের উপস্থিতিতে তাঁর অনুচরেরা দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে দেয়।

দুর্যোধন দুহিতা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাম্বকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে নিবেদন করেন। পরিণতিতে দুর্যোধন নিজ কন্যাকে শাম্বের হস্তে অর্পণ করতে বাধ্য হন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ লগ্নে দেবর্ষি নারদ শাণ্ডিল্য আশ্রমে গিয়ে বলরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলরাম তখন তীর্থ ভ্রমণে ব্যস্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। দুর্যোধন তখন দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নারদ বলরাম সমীপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। নারদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করানো এবং দুর্যোধনকে রক্ষা করা। তবে বলরাম সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ হন। আধুনিক সাংবাদিকতায় সাংবাদিকের মতামত একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রজার সুখ-সুবিধা, শাসক শ্রেণীর ভূমিকা সব কিছুতেই সংবাদপত্র জগৎ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। দেবর্ষি নারদও যে অনুরূপ ভূমিকায় ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

একদিন নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় এসে উপস্থিত হন। ময়দানবের তৈরি করা প্রাসাদে পাণ্ডবরা সুখে শান্তিতে দিন যাপন করছিলেন। নারদ এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁদেরকে কিছু উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। অনুরক্ত মন্ত্রীগণের মন্ত্রণা গ্রহণ করা, অনাথ অতিথিদের সেবা করা, রাজ্যে বৈদ্য-চিকিৎসক রাখা, অধীনস্থ রাজারা

যুধিষ্ঠিরের অনুগত কিনা এরূপ বহু ব্যাপারে মুনি রাজাকে সতর্ক থাকার উপদেশ দেন।

পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদী-সহ বনবাসে গমন করতে বাধ্য হন। নারদ ঋষি এ ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও বিপদ সঙ্কেত হিসাবে বিবেচনা করেন। তখন তিনি কৌরব সভায় এসে এই বিপদের সঙ্কেত প্রকাশ করতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, দুর্যোধনের এই অপরাধের জন্য চৌদ্দ বছর পর পাণ্ডবরা দেশে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় কৌরব বংশ ধ্বংস করতে বাধ্য হবে।

কোনও এক সময় অর্জুন দিব্যাস্ত্র পরীক্ষা করতে প্রস্তুত হন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। নারদ অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেন দিব্যাস্ত্র পরীক্ষা এবং প্রয়োগের বস্তু নয়। এর আবশ্যকতা আসুরিক শক্তির হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করা।

পাণ্ডবদের বনবাস যাপন কালের সূচনা লগ্নে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডব সমীপে গিয়ে হাজির হন। তিনি তাঁদেরকে তীর্থ ভ্রমণের উপদেশ দেন। নারদের মতানুসারে তীর্থ ভ্রমণে গেলে যজ্ঞফল লাভ করা যায় এবং ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়। পুষ্করে স্নান করলে সর্ব প্রকার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েন। তখন নারদ মুনি যুধিষ্ঠির সমীপে এসে শোক ত্যাগ করে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে উপদেশ প্রদান করেন। রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় মহর্ষি নারদ-সহ বহু মুনির আগমন ঘটে। অন্যান্যদের সঙ্গে নারদও রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নারদ সভায় গান গেয়েও সকলের মনোরঞ্জন করেন। শুভ মুহূর্তে উপস্থিত থাকা সাংবাদিকদের কর্তব্য যা দেবর্ষি নারদ পালন করেছিলেন।

নিরপেক্ষতা সাংবাদিকতার একটি মহৎ গুণ। এতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত হলেও প্রকৃত সাংবাদিক একে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। দেবর্ষি নারদও নিরপেক্ষতার প্রদর্শক ছিলেন। নারদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ একটি পারিজাত ফুল পেয়েছিলেন। ফুলটি তিনি সহধর্মিণী রুক্মিনী দেবীকে উপহার দেন। কিন্তু নারদ ব্যাপারটি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী সত্যভামা সমীপে জানিয়ে দেন। এতে সত্যভামা খুবই ক্রোধান্বিতা হন। বাধ্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের নন্দন কানন থেকে যুদ্ধ করে পারিজাত সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন। পরে মহাদেবের প্রচেষ্টায় ইন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বিরতি সম্ভব হয়। প্রকৃত সংবাদ পরিবেশনে দেবর্ষি নারদ কখনও পিছ পা হতেন না।

দেবর্ষি নারদের সাংবাদিকতার এই আদর্শ আধুনিক সাংবাদিকদেরও অনুসরণ করার যোগ্য। ■

কোটাসুর ও শিবপাহাড়ি

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

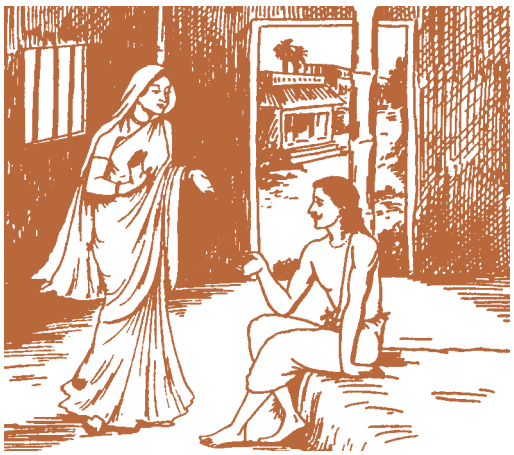

বীরভূম জেলার কোটাসুর মহাভারতে বর্ণিত একচক্রা নগরীর একাংশ। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব কোটাসুরে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দুর্মদ সেন নামে কোনও এক ক্ষত্রিয় রাজা একচক্রায় রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল 'দুর্জয়কোট' (বর্তমান কোটাসুর)। দুর্মদ সেন একদা নিঃসন্তান ছিলেন, পরে মদনেশ্বর শিবের কাছে মানত করে পুত্র লাভ করেন এবং নাম রাখেন মদনদাস। রাজার মৃত্যুর পরে মদনদাস রাজা হন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে বক নামে এক দুর্ষর্ষ রাক্ষস বা অসুর একচক্রায় এসে মদনদাসকে সপরিবারে ধ্বংস করে রাজসিংহাসনে বসে। তখন দুর্জয়কোটের নাম হয় অসুরকোট। পরে অসুরকোট থেকে কোটাসুর নামটি এসেছে।

কোটাসুরে রাস্তার ধারে মদনেশ্বর মন্দিরের তোরণ দেখা যায়। তোরণ পেরিয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই ত্রিমুখী রাস্তার মোড়ে একটা বড় ঢিবি— উঁচু ঢিবির ওপরে পাঁচিল ঘেরা চারচালা মদনেশ্বর শিবমন্দির। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ঢিবিতে। চত্বরে মদনেশ্বর ছাড়া এক পাশে রয়েছে আরও দুটো ছোট শিবমন্দির। কাছেই পাথরের বেদীতে মুণ্ড ভাঙা মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি। আর সিমেন্টের স্তম্ভে পাথরের বড় প্রদীপ— কুন্তীর প্রদীপ। শিবরাত্রিতে কোটাসুরে উৎসব হয়।

বীরভূম জেলার গণপুর থেকে তিন কিলোমিটার একটানা শালবনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছনো যায় শিবপাহাড়ির মালভূমিতে। কাছেই ঝাড়খণ্ড। শিবপাহাড়ির মালভূমিতে রয়েছে একটি আশ্রম; আশ্রমে সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির আছে— একটা দীর্ঘ পাথরের দণ্ডই শিব। পাশে জগদ্ধাত্রী মন্দিরে দেবীর বিগ্রহ আর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শম্ভুবাবা সাধুর মর্মরমূর্তি দেখা যায়। এই শিবপাহাড়িও সুদূর অতীতে পঞ্চপাণ্ডবের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। এখানে মহাভারতের যে-ঘটনাটি ঘটে, তা হলো : কৌরবদের একমাত্র বোন দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথ রথে চড়ে একবার জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে (অথবা গন্তব্যে যেতে গিয়ে) হঠাৎ দ্রৌপদীকে দেখতে পান এবং প্রেমকাতর হয়ে তাঁর প্রণয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু পাঞ্চালী নারাজ হন। তখন জয়দ্রথ তাঁকে বলপ্রয়োগে রথে তুলে হরণ করে নিয়ে চলেন। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে পঞ্চপাণ্ডব তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। অবশেষে ভগ্নিপতিকে ধরে ফেলেন তাঁরা। ধরেই, ভীম তাঁকে বেদম প্রহার করে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেন। অপমানিত জয়দ্রথ শিবপাহাড়িতে এসে, বদলা নেওয়ার বাসনায় সিদ্ধনাথ শিবের তপস্যায় বসেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব আবির্ভূত হয়ে বর দেন, যে কোনও প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রেই জয়দ্রথকে বধ করা দুঃসাধ্য হবে।

সংস্কৃত মহাকাব্য ‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’ এবং রচয়িতা ভারবি

অমিত ঘোষ দস্তিদার

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের মতো মহাকবি ভারবিও তাঁর রচনার কোথাও তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনও কিছুই উল্লেখ করেননি। বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞগণ ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের সন্নিহিত সময়কে ভারবির আবির্ভাবকাল রূপে চিহ্নিত করেছেন। ভারবির পিতার নাম অনেকের মতে শ্রীধর, আবার ‘অবন্তি সুন্দরীকথা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত আনন্দপুরে কৌশিক গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। পরে তাঁরা দাক্ষিণাত্যে নাসিকের অন্তর্গত অচলপুরে বসবাস করতেন। সে বংশের নারায়ণ স্বামীর এক পুত্রের নাম ছিল দামোদর। এই দামোদরই হলেন ভারবি। ভারবির মাতার নাম সুশীলা। তিনি ভৃগুকচ্ছের চন্দ্রকীর্তির কন্যা রসিকাকে বিবাহ করেন। একটিমাত্র মহাকাব্য ‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’ ভারবিকে লোকোত্তর খ্যাতি দান করেছে।

অষ্টাদশ সর্গে রচিত মহাকাব্যটির মূল গল্পটি হলো— কপট পাশা খেলায় সবকিছু হারিয়ে যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে বসবাস করার সময় তাঁর একজন দূতকে ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে দুর্যোধনের শাসনকার্যের বৃত্তান্ত আনতে পাঠালেন। দূত সমস্ত খবর সংগ্রহ করে দ্বৈতবনে এসে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন, দুর্যোধন নৈপুণ্যের সঙ্গে সুশাসন করছেন। যুধিষ্ঠির একথা দ্রৌপদী এবং অন্যান্য ভাইদের জানালেন। সকলেই যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কোনও ভাবেই বিচলিত না হয়ে, হঠকারিতা না করে সময়ের অপেক্ষায় থাকাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করলেন।

অর্জুন দ্বৈতবনে বসবাস সময়ে নিজেকে নানাভাবে তৈরি করতে লাগলেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করলেন এবং পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য তাঁকে

ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করার উপদেশ দেন। ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুন তপস্যায় বসলেন। ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যাভঙ্গের জন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের পাঠালেন। সকলের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অবশেষে মুনিবেশধারী স্বয়ং ইন্দ্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর স্থির প্রতিজ্ঞায় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে পুনরায় স্থির প্রতিজ্ঞায় শিবের আরাধনা করার উপদেশ দেন। অর্জুন শিবের আরাধনা শুরু করলেন। সমস্ত দেবতার অনুরোধে শিব কিরাতের ছদ্মবেশে অর্জুনের কাছে আসামাত্র এক বন্য বরাহ অর্জুনকে আক্রোমণোদ্যত হলে— একই সঙ্গে কিরাত এবং অর্জুন বরাহটিকে বাণবিদ্ধ করেন। ভূলুণ্ঠিত বরাহর শরীর থেকে অর্জুন তাঁর বাণটি আনতে গেলে অর্জুন ও কিরাতের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট মহাদেব নিজের রূপ ধারণ করলেন এবং অর্জুনের অভীষ্ট পাশুপত অস্ত্র এবং ধনুর্বেদ দান করলেন।

মহাকবি ভারবি ‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’ মহাকাব্যটি মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের বনপর্ব এবং শিবপুরাণ-এর উপর নির্ভর করে মহাকাব্যোচিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে রচনা করেছেন। ভারবি বর্ণনানিপুণ কবি। এই মহাকাব্যে তিনি রাজনীতি, মন্ত্রণা, ক্ষাত্রধর্ম, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় যেমন তাঁর বর্ণিত করেছেন, তেমনি আবার বন, পর্বত, ঋতু, বনবিহার, সন্ধ্যা, প্রিয়মিলন প্রভৃতি নানান উপভোগ্য চিত্রও তুলে ধরেছেন। শিল্পিত অলংকার প্রয়োগ ভারবির রচনানীতির অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি, সমাশোক্তি ইত্যাদি অলংকার তাঁর লেখায় অলংকৃতি হয়ে ছড়িয়ে আছে।

মহাকবি ভারবির রচিত একমাত্র মহাকাব্য ‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’-এর উপর টীকা রচনা করেছেন প্রায় কুড়িজন বিদগ্ধ টীকাকার। উক্ত টীকাকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন নরহরি, একনাথ, গদাসিংহ, কাশীনাথ, ধর্মবিজয়, হরিকণ্ঠ, ভরত সেন, প্রকাশবর্ষ ও মল্লিনাথ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসোত্তর যুগে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে মহাকবি কালিদাসের উত্তরসূরিরূপে পাঁচজন মহাকবির নাম গৌরবচ্ছটায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই পাঁচজন মহাকবি হলেন ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষ। কালিদাসোত্তর যুগের মহাকবি ভারবিকে রবি অর্থাৎ সূর্যের মতোই ভাস্বর বলে মনে করা হয়। তাই বলা হয়েছে,— ‘ভারবের্ভাতি রবিরিব।’

‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’ মহাকাব্যটি বীররসে সমৃদ্ধ এবং প্রারম্ভিক শ্লোকে রয়েছে বস্তুনির্দেশ বা বিষয়বস্তুর সূচনা। মহাকবি ভারবির কাব্যেই প্রথম কৃত্রিম সাজসজ্জার বাহুল্য দেখা যায়। তাঁর কাব্যে ভাব এবং ভাবের বাহন ভাষা— এই দুইয়ের মধ্যে ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভাব হয়েছে গৌণ, ভাষা হয়েছে মুখ্য। মহাকাব্যটির প্রতিটি সর্গশ্রুতি সুখকর নানা ছন্দে রচিত এবং প্রতি সর্গের শেষে ছন্দ প্রয়োগে পরিবর্তন রয়েছে। বিষয়বস্তু বা মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর ভিত্তি বোঝাচ্ছে এবং অর্জুনের থেকে শিব অধিক পূজ্য, তাই নামকরণরূপী সমাসবদ্ধ পদটিতে ‘কিরাত’ শব্দটি সর্বাগ্রে বসেছে। তাছাড়া, ‘কাব্যম’ শব্দের সঙ্গে সমানাধিকরণবশত ‘কিরাতার্জ্জুনীয়ম্’ পদটিও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাকবি ভারবি সেই সময়কার ব্যাকরণ ও অভিধান পঠনপাঠনের ব্যাপক প্রসারতাকেও তাঁর মহাকাব্যে অধিকতর মান্যতা দিয়েছেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

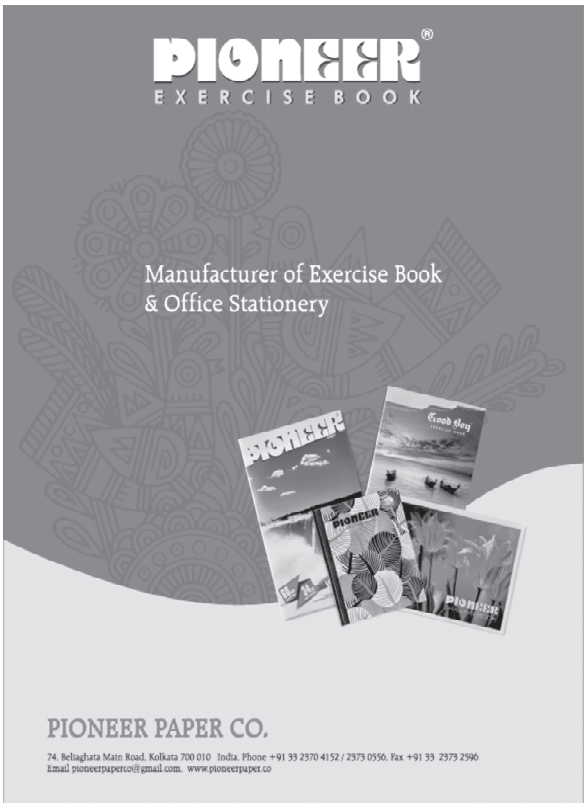

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

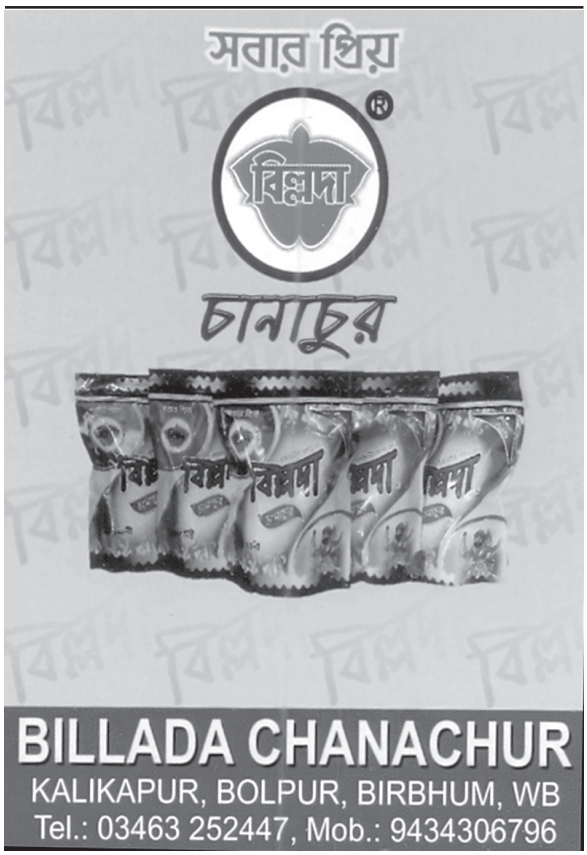

হারিয়ে পাওয়া

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়

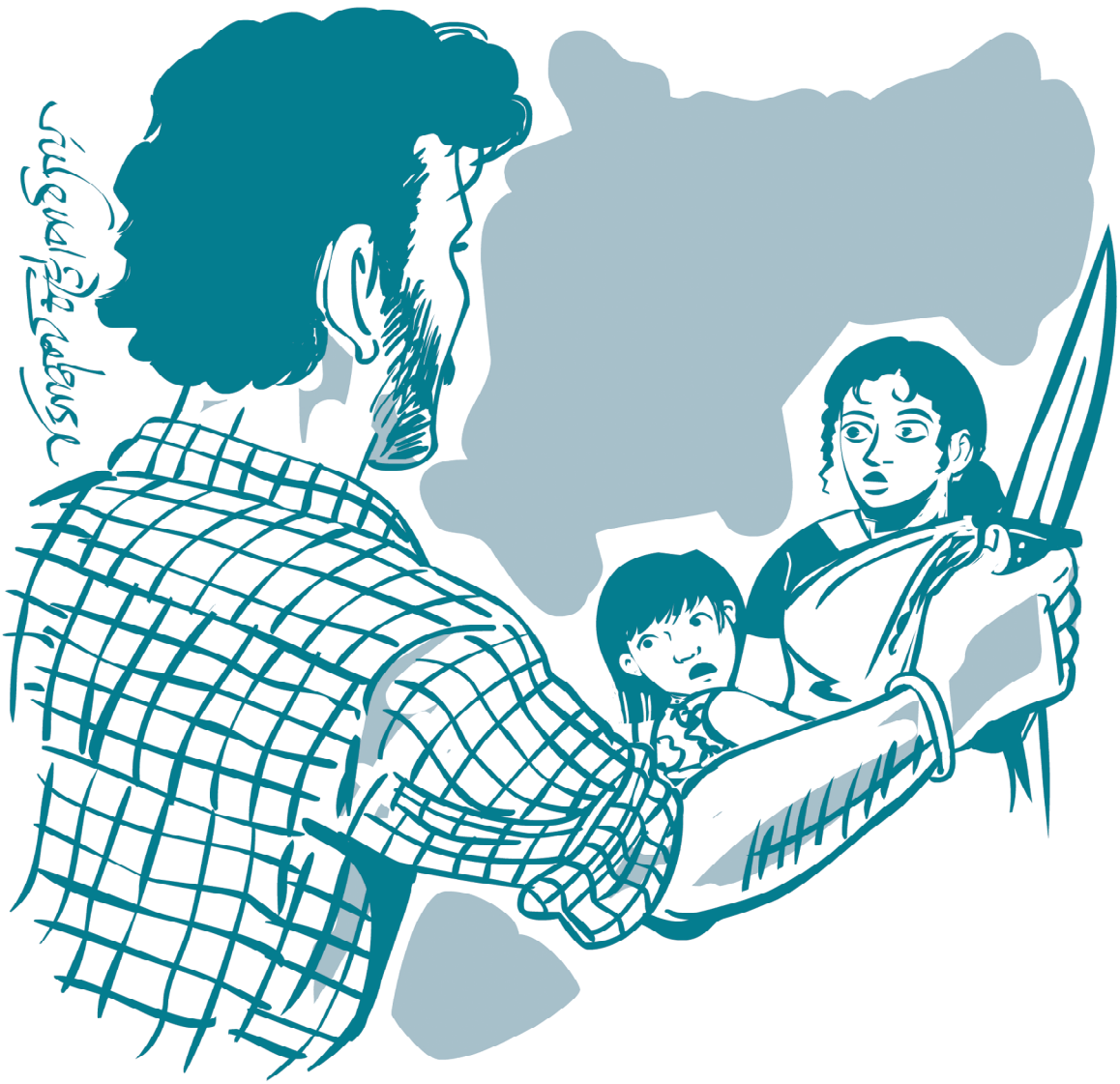

সবার বিরুদ্ধে সরযূ প্রতীককে বিয়ে করে বসল। অবশ্য রেজিস্ট্রি করে। সাক্ষী বলতে প্রতীক ও তার একজন করে বন্ধু। বাবা রেগে গিয়ে সবার সামনে তাকে ত্যাজ্য কন্যা করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাকি আত্মীয়দের মুখেও সেই একই রা। দোষের মধ্যে প্রতীক সিডিউল কাস্ট। সরযূ ভাবে এখনো এই জাতপাত নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি! ভগবান কী মানুষকে কোন্ জাত স্ট্যাম্প মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? তবুও মানুষ জাত-জাত করে খেদিয়ে মরছে। এর জন্যে কতো অনারকিলিং পর্যন্ত হচ্ছে। সরযূ হাসে। কত বড় গালভরা নাম, 'অনারকিলিং'! মূর্খ, অতি মূর্খ। ব্লাডব্যাঙ্কে রক্তের বোতলে কী ছাপমারা থাকে, এটা ব্রাহ্মণের, এটা শূদ্রের বলে? দরকার পড়লে কার রক্ত কার গায়ে যাচ্ছে, তার হিসেব কে রাখে? যত্তোসব ঢং, ন্যাকামো। গা জ্বলে যায়! সরযূ মাথা উঁচু করেই প্রতীকের কাছে চলে এসেছিল। পেছন ফিরে আর তাকায়নি।

বিয়ের পর বছর চারেক বেশ ভালোই কেটেছিল। সুখে দুঃখে জীবন

কিন্তু সুখের পাল্লাটা ছিলো বেশ ভারি। সরযূর সারা মন জুড়ে শুধু প্রতীক। আর কোনও চিন্তা মনে আসেনি। কিন্তু সরযূর বিশ্বাসের নৌকো প্রতীকের কথার ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

হঠাৎ একদিন প্রতীক এসে বলল, অনেকদিন তো হল। এবার তুমি নিজের পথ দেখো।

—মানে? সরযূর ভ্রূযুগলের উপত্যকা তীক্ষ্ণ হয়। প্রতীকের মুখে কঠিন হাসি। বলে—'আমি তো হিব্রুভাষায় বলিনি। সোজা বাংলাভাষায় বলেছি। অবশ্য বাবা-মার কাছেও ফিরে যেতে পারো, তবে সেটা তোমার মর্জি। সরযূ অসহায় কণ্ঠে বলে, সে পথ তো নিজের হাতেই বন্ধ করে এসেছি, কিন্তু আমার অপরাধ? প্রতীকের মুখে এবার কদর্য হাসির ছিটে। বলে—তুমি বাঁজা। বাঁজা বউ আমি চাই না।

—আমি বাঁজা, না তুমি? পরীক্ষা করিয়ে দেখেছো?

—দরকার নেই। তার প্রমাণ ফুল্লরা।

—ফুল্লরা? সরযূর কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ে।

—হ্যাঁ। ফুল্লরা আমার ছোটোবোনের বন্ধু। ও আমার সন্তানের মা হতে চলেছে। তোমাকে আর ডাক্তার পরীক্ষা করানোর দরকার নেই। দুই আর দুই-এ চার। তুমি ডিভোর্স চাও তো এই কাগজে সই করে দাও। ভাব তো বাচ্চা ছাড়া বিয়ের কী দাম? আমি ফুল্লরাকে বিয়ে করছি।

সরযূর কণ্ঠে শ্লেষ ঝরে পরে। তাহলে, এই তোমার ভালোবাসা? ভেতরে ভেতরে, এতবড় ষড়যন্ত্র? এত সব করেছো, ভেবেছো...অথচ আমায় কিছু বলোনি?

—বলার দরকার হয়নি। ভেবেছিলাম যদি আমার দোষ থাকে, তাহলে ফুল্লরার বাচ্চা হবে না। তখন ফুল্লরাকে ছেড়ে আর কাউকে খুঁজতে হবে।

—বাঃ বাঃ সাবাস! তুমি মেয়েদের কী মনে কর গিনিপিগ্? নাকি বাচ্চা দেওয়ার মেসিন? তোমার সঙ্গে এতদিন ঘর করেছি, ভাবতেও খারাপ লাগছে! সত্যি মানুষ চেনা কত শক্ত। তুমি যে এতটা পারভার্টেড বুঝতে পারিনি। সরযূর চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে এবার আগুন ছোটে। বলে,—যে ভালোবাসার জোরে বাড়ি ছেড়েছি, বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সব ছেড়েছি সেই ভালোবাসাই যখন তোমার গোল্লায় গেছে, তখন এখানে থাকা অবান্তর। আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। দাও তোমার ডিভোর্স পেপার। তবে ভবিষ্যতে কখনও তোমার মুখ দেখিও না। সই করে, নিজের সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে সরযূ বেরিয়ে এসেছিল। প্রতীকের দিকে আর ফিরেও তাকায়নি।

এম. এ পাশটা করাছিল, তাই সে ভেঙে পড়েনি। একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি আর কোয়ার্টার পেয়ে, পায়ের তলার মাটি পেয়েছিল। সরযূ জানে, অতীত জীবনে তার ফিরে যাবার রাস্তা বন্ধ। এখন তার এই জীবনটা তাকে নিজেকেই চালাতে হবে।

এই অফিস পাড়াটা ভালো। এক কথায় ভদ্রপাড়া। অল্পদিনেই তার ভালো মেয়ে বলে সুনাম হয়েছে। এখন সকলে জেনে গেছে, সে স্বামী পরিত্যক্তা। ফলে সহজে সকলের সহানুভূতি পেয়েছে। এদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে যায়। একটাই দুঃখ, যদি একটা ছেলে বা মেয়ে থাকত। তাহলে তাকে অবলম্বন করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া সহজ হতো। নিঃসঙ্গ একা জীবন বড় কষ্টের।

কাল দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী। তার কোয়ার্টার থেকে একটু দূরে গলির মোড়ের মাথায় মিলন সঙ্ঘের জমজমাট পুজো। ক্লাবের ছেলেগুলো তাকে বৌদি বলেই ডাকে, সম্মান করে।

সারারাত ধরে কখনো জোরে, কখনো আস্তে বৃষ্টি হয়েছে। ভোররাতে একদল কুকুরের ডাকে সরযূর ঘুমটা ভেঙে যায়। কুকুরগুলো এত চেঁচাচ্ছে কেন? থামছেই না। সরযূ জানলা খুলে দেখার চেষ্টা করে। এখন বৃষ্টি থেমেছে। লাইটপোস্টের নীচে সাদা ন্যাকড়া জড়ানো ওটা কী? হঠাৎ বাচ্চার কান্না কানে আসে। সরযূ আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে একটা ছোটো লাঠি হাতে ছুটে বাইরে আসে। আকাশে এখনো আবছা অন্ধকার। লাঠি নিয়ে তেড়ে যেতেই কুকুরগুলো সরে যায়। কিন্তু চলে যায় না। দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতেই থাকে। সরযূ দেখে ন্যাকড়ার মধ্যে ফুটফুটে একটা মেয়ে। আহা রে! কোন কসাই-মা এই দুধের শিশুকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ফেলে গেছে। যদি কুকুরগুলো ছেঁড়াছিঁড়ি করতো? সরযূ বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে আসে। কুকুরগুলো পিছনে আসার চেষ্টা করে। সরযূ আবার লাঠি দেখাতেই কুকুরগুলো সব সরে পড়ে। সরযূ নিজের মনে বলে—আজ দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন, আমার কোল আলো করে এলি মা। তুই-ই আমার মা জগৎ জননীর দেওয়া মেয়ে। আজ থেকে তুই-ই আমার মা-দুগ্গা।

সরযূ এবার পরম মমতায় বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে, গরম জলে গা মুছিয়ে, নিজের পুরোনো শাড়ি ছিঁড়ে ওর গায়ে জড়িয়ে, বাটি করে সকালে চায়ের জন্যে রাখা দুধ, অল্প গরম করে চায়ের চামচে করে একটু একটু করে খাইয়ে দিল। আরাম পেয়ে বাচ্চাটাও ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হতেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে করে থানায় গিয়ে আইন সঙ্গতভাবে মেয়েটাকে তার নিজের কাছে রাখার পাকা ব্যবস্থা করে। তবে বাড়ি ফেরে সরযূ। দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে যায়। সরযূ এবার দুগ্গাকে নার্সারিতে ভর্তি করে দেয়। মেয়েটা হয়েছেও তেমনি তার ন্যাওটা। এখন প্রতীককে মনেই পড়ে না। দুগ্গাকে পেয়ে সরযূ খুব খুশি। দিনগুলো এক নতুন ছন্দে এগিয়ে চলে।

কিন্তু সরযূ জানে না। ভাগ্য তাকে নিয়ে আর এক নতুন খেলায় মেতেছে। পাঁচ বছর পর আর এক অষ্টমীর সন্ধ্যে। জোরে জোরে মাইক বাজছে। সঙ্গে জোড়া ঢাকের বাজনা। এই সময় অঘটনটা ঘটে যায়। সরযূ দুগ্গার সঙ্গে বসে খেলছে। হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজা বাইরে থেকে খুলে যায়। ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। আজ এত বছর এবাড়িতে আছে, কখনও তো এমন হয়নি। ভীতকণ্ঠে বলে—আপনি কে? কী করে ঢুকলেন? কেন এসেছেন? রোদে পোড়া ফর্সা বিবর্ণ রং তামাটে ঘেষা। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, চোখে মুখেও একটা কঠিন রুক্ষতা। লোকটা কর্কশ সুরে বলে—কেন এসেছি বুঝতে পারলেন না? এখুনি সব বুঝিয়ে দেবো। আমি আপনার সব খবর জানি। স্বামী ত্যাগ করেছে, মেয়েটাকে আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। এখন অযথা সময় নষ্ট করবেন না। আগে বাচ্চাটাকে পাশের ঘরে পাচার করুন। লোকটা একটা বড় ঝকঝকে ছোরা বার করে বলে—কুইক! না হলে?

ছোরা হাতে লোকটাকে মায়ের দিকে এগোতে দেখে দুগ্গা সরযূকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে—আমার মাকে কিছু করো না গো। আমার মা খুব ভালো। মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি মাকে ছেড়ে দাও। বাচ্চাটার দুচোখে জলের ধারা। দু'হাতে নিবিড় করে সরযূকে জড়িয়ে

ধরে আছে। সরযূর দিকে এগোতে গিয়েও লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ত্রিশ বছর আগের একটা রাত লোকটার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চার বছরের এক বাচ্চা ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরে, অঝোর ধারায় কাঁদছে। বাচ্চাটার বাবা বাচ্চাটার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দেয়, মাকে ছাড় বেজন্মা। —'ওগো একথা বলো না। ও তোমার ছেলে।' লোকটা হিসহিস করে ওঠে—আমি জানি। সব জানি। মাকে ছাড়, হারামজাদা নাহলে দেখাচ্ছি তোকে—বাবা মায়ের কাছ থেকে জোর করে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেঁচড়াতে ছেচড়াতে দরজা খুলে রাস্তায় ঠেলে বার করে দরজা দেয়।

—মা...মা...মাগো! ছেলেটির আর্ত কান্না রুদ্ধ দরজায় আছড়ে পড়ে।

—হারামজাদা, এখনো যাসনি? এবার তোকে পিটিয়ে মারবো। দরজা খুলে লাঠি হাতে মারমুখী বাবাকে দেখে প্রাণভয়ে বাচ্চাটা বাঁচাও বাঁচাও বলে, পড়ি কী মরি করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। ধাক্কা লাগে কুখ্যাত রামগুণ্ডার সঙ্গে। ওই ধাক্কায় ছেলেটার জীবনের সবকিছু বদলে যায়। নতুন জীবন শুরু হয় রামগুণ্ডার সঙ্গে। তারপর জীবনের কত খানাখন্দ পেরিয়ে আজ সে এই পথে। তবে চুরিচামারি, মস্তানি করলেও হাতে তার কোনও রক্তের ছাপ লাগেনি। যা করেছে শুধু ভয় দেখিয়ে। দুগ্গা এবার সরযূকে ছেড়ে ছুটে এসে লোকটার দু-পা জড়িয়ে ধরে, —ওগো আমার মাকে ছেড়ে দাও।

—বেশ, তোর মাকে ছেড়ে দেবো। তাহলে কী দিবি?

—তুমি যা চাইবে। দুগ্গা চোখে মুছে বলে, আমার পুতুল মেয়ে রাজকন্যাকে দেবো, দম দেওয়া রেলগাড়ি, এরোপ্লেন—সব দেবো। তুমি সব নাও। নিয়ে মাকে ছেড়ে দাও।

—আর কিছু দিবি না? লোকটা হাঁটু গেঁড়ে দুগ্গার পাশে বসে পড়ে। দুগ্গা বলে তোমায় পাপ্পি দেবো? বলে দুগ্গা লোকটার দুগালে দুটো হামু দিয়ে বলে, এবার মাকে ছেড়ে দেবে তো?

—না। আর একটা জিনিস চাই, দিবি? লোকটার দুচোখে জল। লোকটার দুচোখে জল দেখে দুগ্গা তার ছোট্ট কচি হাত দিয়ে জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—এমা! এতবড় ছেলে কাঁদে না!

লোকটা রুদ্ধস্বরে বলে—আমার কানে একবার বাবা বলে ডাক, আর কাঁদবো না।' দুগ্গা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে—'ওমা! তুমি আমার বাবা?

—হ্যাঁরে, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর! লোকটা সরযূর বিস্মিত মুখের দিকে তাকায়। দুচোখে করুণ মিনতি ঝরে পড়ে। তুমি হ্যাঁ বললে, আমার জীবনটা ঘুরে যাবে। আমি দুগ্গার বাবা হয়ে যাবো। প্লিজ! না করো না। সামাজিকভাবে আমি তোমাকে চাই। এ জীবন ছুঁড়ে ফেলে, আমি তোমার মনের মতো হবো। দুগ্গার বাবা যে আমি।

সরযূ কী জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে? পুজোর মণ্ডপে অষ্টমীর বাজনার সঙ্গে সন্ধ্যারতি চলছে। লোকটা বলে—আমি সুরজ। মা ওই নামেই ডাকতো। আর তুমি তো সরযূ। দেখ, ভগবান আগে থেকেই আমাদের নামের মিল করিয়ে রেখেছেন। সুরজের কথায় সরযূ চমকে ওঠে। একটু আগের সুরজকে এখনকার সুরজের সঙ্গে মেলাতে পারে না। সুরজ বলে, চল, আমরা মায়ের আরতি দেখতে যাই। সুরজ দুগ্গাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বলে, সকলকে বলবে, দুগ্গার বাবা চলে গেছিল, ফিরে এসেছে। তোমার কাছে সিঁদুর আছে? সরযূর দুচোখে লজ্জা। বলে, আছে, ফেলতে পারিনি।

—খুব ভালো। সিঁদুরের কৌটোটা সঙ্গে নাও। মা দুর্গার সামনে। সকলের উপস্থিতিতে, আমি তোমায় সিঁদুর পড়াতে চাই। আনুষ্ঠানিক বিয়েটা, আবার নতুন করে হবে। পুজোমণ্ডপের পুরুত মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে, দিন ঠিক করে নেবো কেমন? বাবা দাঁড়াও। মা, চিরুনিটা আাগে দাও তো। বাবার চুলটার কী অবস্থা দেখেছো? আগে ভালো করে আঁচড়ে দি। চুল আঁচড়ে দিয়ে দুগ্গার মুখে হাসি ফোটে। বলে, দেখ বাবাকে কী সুন্দর লাগছে। সরযূ দুগ্গাকে এক অনাবিল স্নেহের আবেগে বুকে টেনে নিয়ে বলে, আমার হারিয়ে যাওয়া সেই মা, আমার কাছে আবার ফিরে এসেছে। ওরা, মায়ের পূজা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে চলে। ■

ছোট্ট পিঁপড়ের কাহিনি

একটা ছোট্ট পিঁপড়ে ছিল। সে একদম একা একা থাকত। নিশ্চয়ই এটা শুনে তোমরা বলবে, পিঁপড়েরা তো একা একা থাকে না। সকলে দল বেঁধে থাকে। সবাই খাবার মুখে করে নিয়ে সার বেঁধে চলে। কিন্তু নাহ্! এই পিঁপড়েটা একা, একদম একা থাকত। ওর কোনও বন্ধু বা আত্মীয় ছিল না। তাই ও খুব দুঃখী ছিল। এই বিশাল পৃথিবীতে তার কেউ ছিল না। সে একা একাই গাছের আড়ালে, পাতার ওপরে নীচে ঘুরে বেড়াত। একা একাই শীতের জন্য খাবার সংগ্রহ করত আর একাই খেত। তারপর ঘুমিয়ে পড়ত।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই ঘুরে ফিরে আসে ভয়ানক স্বপ্ন। ভীষণ রকমের এক ঝোড়ো হাওয়া আর তার সঙ্গে সাংঘাতিক রকমের বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা মাটিতে পড়ছে। কী ভীষণ ভয়ানক শব্দ করে বাজ পড়ছে। বড় বড় গাছের ডাল, পাতা খসে পড়ছে আর প্রচণ্ড বৃষ্টির জল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। ছোট্ট পিঁপড়ের মনে পড়ে সেই বানভাসি জলে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদু, ঠাকুমা সবাই ভেসে গিয়েছে। শুধু সে একটা ছোট্ট গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে বেঁচেছে। বেশ কয়েকদিন সে সেইভাবেই ছিল। ক'দিন হবে তা ঠিক মনে নেই। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারপরই সে একা, একেবারে একা হয়ে যায় ছোট্ট পিঁপড়ে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোট্ট পিঁপড়ে দেখতে পেল যে গাছের গোড়ায় সে থাকে সেখানে একটা সাদা রঙের বল। সে মুখ দিয়ে বলটাকে একটু ঠেলতেই সেটা ফেটে চৌচির। সেখান থেকে একটা সবুজ রঙের কী রকম চার পাওয়ালা জন্তু বেরিয়ে এল। আর তার কী কান্না। ছোট্ট পিঁপড়ে বুঝতে পারল নিশ্চয়ই এই ছোট্ট শিশুর খুব খিদে পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি ছোট্ট ছোট্ট চিনির দানা নিয়ে এল।

তারপর দু'জনের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ছোট্ট পিঁপড়েও একজন বন্ধু পেয়ে গেল। দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে। তাদের জীবনে প্রদিনই নানান রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে থাকল।

তাদের বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে কোন দিকে মোড় নিল তা জানার জন্য দেখতে হবে 'মাই হোম ইজ গ্রিন' নামের ছবিটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কোট্টায়াম ডিজিট্যাল নামের একটি সংস্থা। ২০১০ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। সম্প্রতি ইউটিউবে ছবিটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। এখন ইউটিউবে সকলেই বিনামূল্যে ছবিটি দেখতে পাবে।

তবে ছবিটি দেখার আগে ছবির মূল ভাবনা ও তথ্য সম্পর্কে জানিয়ে রাখি। ছবিটির শুরুতেই স্ক্রিনে ফুটে উঠবে একটি বিশেষ বার্তা। কেরালার কাসারগোড অঞ্চলে যেসব শিশু এন্ডোসালফান দুর্ঘটনায় মারা গেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলি।

কেরালার কাসারগোড জেলা জুড়ে রয়েছে প্রচুর কাজুবাদামের বাগান। জায়গাটি বিখ্যাত কাজুবাদামের জন্য। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সরকার থেকে হেলিকপ্টারে করে এন্ডোসালফান নামের কম দামি কীটনাশক ছড়াত। এর ফলে নাকি কাজুবাদাম অনেক বেশি উৎপাদন হবে। প্রায় ১২ হাজার একর জুড়ে কাজুবাদামের এই জমির মধ্যেই ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম। এই কম দামি কীটনাশকের প্রভাবে তাদের গবাদি পশু মরতে লাগল। মাছ, মৌমাছি, পিঁপড়ে, সাপ, ব্যাঙ, পাখি মারা যেতে লাগল। বিকৃত আকৃতির পশুর জন্ম হতে লাগল। শিশুদের সেরিব্রাল পালসি, বিকলাঙ্গতা, এপিলেপ্সি হতে লাগল।

বস্তুত এন্ডোসালফান এক ধরনের ভয়ানক কীটনাশক। পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশ তাদের দেশে নিষিদ্ধ করেছে। এটা জানা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কেন ব্যবহার করা হয় তা জানা যায়নি। বহু মানুষ এই নিয়ে আন্দোলন করেছেন। ২০১১ সালে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এন্ডোসালফানের উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

দুঃখের বিষয় হলো, এখনও এই কীটনাশক ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। 'মাই হোম ইজ গ্রিন' ছবিটি দেখার সময়ই দেখতে পাবে সেখানে এন্ডোসালফানের কৌটো দেখানো হয়েছে।

ছোট্ট পিঁপড়ে আর তার বন্ধু কীভাবে এই কীটনাশক থেকে বাঁচল সেটাই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটি টেকনোলজিক্যালি উন্নত মানের নয়। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে জোরালো বার্তা আর সমাজ সচেতনতার কথা আছে তা আমাদের সবার জানা খুব জরুরি। তাই অবশ্যই দেখো 'মাই হোম ইজ গ্রিন' ছবিটি।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের পথে পথে

মৌরাং

মণিপুর রাজ্যের ইন্দো-বার্মা সড়কের ওপর মফস্‌সল শহর মৈরাং। লেকের পশ্চিমপাড়ে শহর। লেক জুড়ে রয়েছে ভাসমান বাগিচা। অমর প্রেমের গাথা খাম্বা-থৌইবি নৃত্যকলার সৃষ্টি মৈরাংয়ে। মে মাসে বনদেবতা থংজিংয়ের প্রাচীন মন্দিরে জাঁকালো উৎসব হয়। মণিপুরী লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান মৈরাংয়ে ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অর্থাৎ ভারতের জাতীয় বাহিনী প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সরকার গঠন করে। ৩ মাস মৈরাং স্বাধীন ছিল। মৈরাংয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্মারক নিয়ে তৈরি হয়েছে মিউজিয়াম।

জানো কি?

- বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) প্রথম রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।
- গুজরাট নবরাত্রি উৎসবে গরবা নাচ হয়।
- মালদার গম্ভীরা গান গাওয়া হয় শিবঠাকুরের নামে।
- বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।
- মৌর্যযুগের গুপ্তচর বিভাগের নাম ছিল সঞ্চারা।

ভালো কথা

পক্ষীদাদু

পল্টু সেদিন আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। কী জন্য বলেনি। বাড়িতে গিয়ে দেখি ওর দাদু ২০/২৫টি বিভিন্ন পাখির ছানাকে পোকামাকড়, মুড়ি খাওয়াচ্ছে। পল্টুই বললো ঝড় হলেই দাদু ওগুলোকে গাছতলা থেকে কুড়িয়ে আনে। ঝড়ে বাসা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। বেশিরভাগই মারা যায়। দাদু বললো— উড়তে শিখলেই এদের আমি ছেড়ে দিই। ওদের মা-বাবা কাছে কাছেই থাকে, কখনো কখনো খাবার খাইয়ে যায়। পাড়ায় পল্টুর দাদুকে ছোটরা পক্ষীদাদু বলে ডাকে। আমার বাবা বললো— পল্টুর দাদু কলেজে জীবন বিজ্ঞান পড়াতেন। খুব পাখি ভালোবাসেন।

রতন দাস, একাদশ শ্রেণী, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ড়ো এ ব ড়ো খে	(১) ন ন্তা স ন্যা ক
(২) র ক কু থ ঠা	(২) বা বু ই মা জা

৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) উত্তরভারতীয় (২) উৎসাহজনক

৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) একবীজপত্রী (২) ঐতিহ্যসম্পন্ন

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) অনিতা সিংহ, আমতলা, মুর্শিদাবাদ। (৩) কল্লোল মিত্র, দ: ২৪ পরগনা, ডায়মন্ডহারবার। (৪) বিকাশ সিংহ, টালাপার্ক, কলকাতা-২।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ৯

অভিমন্যুর সাহায্যে অনেকে এগিয়ে এলেন। ভীষ্ম যুদ্ধ চালিয়ে যান। যা হোক, প্রথম দিনটা ভীষ্মের ভাল গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের উৎসাহিত করেন।

দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিনের জয়ে কৌরবরা খুশি ছিল, তাই পরের দিন তত জোর দেয় না। তবু...

দ্বিতীয় দিন পাণ্ডবেরা জয়ী হল।

অতএব যুদ্ধ চলে। কখনও পাণ্ডবেরা জেতে, কখনও কৌরবরা।

শিবার লক্ষ্য এশিয়াডে সোনা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমের শিবা থাপাকে অনেকে বলেন ভারতের মাইক টাইসন। টাইসন ছিলেন দামাল ঝড়, কালাপাহাড়। তুলনায় শিবা অনেক শান্ত, বিনয়ী, আবেগপ্রবণ বক্সার। কমনওয়েলথ গেমসে যেতে না পারার যন্ত্রণায় চোখে-মুখে যেন আগুনে জেদ আর অসীম আত্মপ্রত্যয়। আসন্ন এশিয়ান গেমসকে পাখির চোখ করে লড়াইয়ের শপথ নিচ্ছেন। অধরা মাধুরি সেই এশিয়াডে সোনার খোঁজে জীবনকে বাজি রেখে চলতে রাজি শিবা। কথাবার্তাতেও যেন তারই প্রতিধ্বনি।

□ জাকার্তা এশিয়াড যেন জীবনের অস্তিত্বের প্রতীক?

● ঠিক কথা। এশিয়াড বড় মঞ্চ। চীন, কোরিয়া, থাইল্যান্ডের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে যদি সোনা জিততে পারি, তাহলে মনে করব বড় কিছু করে দেখাতে পেরেছি। এর আগের এশিয়াডে সোনা জিতেছি। পরের গেমসে জিততে পারলে অনন্য কীর্তির অধিকারী হব। এর আগে কৌর সিংহ, ডিঙ্গো সিংহ, মেরি কম একবার করে সোনা জিতেছেন। ব্যাক টু ব্যাক স্বর্ণপদক কারুরই নেই। আমি সেটাই করে নিজেকে ও ভারতীয় বক্সিংকে অন্য মাত্রা প্রদান করতে চাই।

□ বক্সিং জীবনের শুরুতে কী কী সমস্যা হয়েছিল?

● মাত্র ৭-৮ বছর বয়সে আমার বক্সিং প্রতিভা প্রথমে নজরে আসে আমার বাবা পদম সিংহের। শুরুর দিকে সমস্তরকম সহযোগিতা পেয়েছি বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছ থেকে। কিন্তু একটু বড় হতে প্রতিযোগিতামূলক বক্সিংয়ে আমার খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়। মাসে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা প্রয়োজন পরিপূর্ণ বক্সার হিসেবে গড়ে উঠতে গেলে। গুয়াহাটি সাই কেন্দ্র তখন আমাকে নিয়ে নেয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি। তারপর আন্তর্জাতিক বৃহৎ মঞ্চে পদক জেতার জন্য যে প্রজেক্ট স্কিম করা হয়েছে, পাবলিক-প্রাইভেট জয়েন্ট এন্টারপ্রেইনারশিপ কালেকটিভ এফোর্ট মেধা স্কিমে সুযোগ পেয়ে যাই। ওটাই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ওই প্রজেক্টই আমাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

রিং-সে প্রতিপক্ষের মুখে শিবার পাঞ্চ।

আন্তর্জাতিক মানের ফাইটার করেছে।

□ প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য কীভাবে এল?

● মাত্র ১৫ বছর বয়সে ২০০৮ সালে রাশিয়ার পাহাড়ি জনপদ ইয়াকটসুতে এশিয়া-ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস মিটে যাই, শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে দেশে ফিরে আসি। ওই মিট আমাকে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে সাবালক করে দেয়। বুঝে যাই বড় বড় আন্তর্জাতিক মিটে আমি পদকের প্রত্যাশা নিয়ে রিংয়ে নামতে পারি।

□ আপনার সাফল্যের খতিয়ান জানতে ইচ্ছুক পাঠক।

● ২০০৯-য়ে আর্মেনিয়াতে যুব বিশ্ব চাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজি বিভাগে মনোনীত হই। ওখানেও পোডিয়াম ফিনিশ করে ব্রোঞ্জ পদক তুলে আনি। একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আমিই ওখানে পদক জিতেছিলাম। পরের বছর ইরানে এশিয়ান ইয়ুথ বক্সিং মিটে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপ আমাকে হতাশ করেনি। ফাইনাল পর্যন্ত টিকে ছিলাম। সেমিফাইনালে কবজিতে চোট লেগে যাওয়ায় ফাইনালে আজারবাইজানের বক্সারের বিরুদ্ধে তেমন লড়াই দিতে পারিনি। রুপো জিতে সে বছরই ইয়ুথ ইউনিভার্সিয়াডে নামার যোগ্যতা পেয়ে যাই লাইট মিডলওয়েট বিভাগে (৬০ কিলো)। সব বিশেষজ্ঞকে চমকে দিয়ে একেবারে ফাইনালে পৌঁছে যাই। কিউবান বক্সারের সঙ্গে তুল্যমূল্য লড়ে পয়েন্টে হার স্বীকার করি। তবে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে বিশ্ববৃত্তে ভারতীয় বক্সারও কিছু করে দেখাতে পারে।

□ এশিয়ান মিট, এশিয়াডে সোনাও আপানার জিম্মায়?

● ২০১৪-তে ভারতের অন্যতম বক্সার হিসেবে জর্ডনে সোনা জিতি। পরের বছর ইনচিওন (দক্ষিণ কোরিয়া) এশিয়াডে সোনা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। প্রত্যেক রাউন্ডে নকআউট করে দিই সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ফাইনালে কাজাখাস্তানের ফাইটারকে গোটা রিংয়ে ছুটিয়ে বেদম করে নকআউট করি কিলিংজারের সাহায্যে। ওই এশিয়াড সোনাই আমাকে পরবর্তীতে আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড সিরিজে সুযোগ করে দেয়। আমি প্রথম ভারতীয় বক্সার হিসেবে বিশ্ববক্সিং লিগে নামার সুযোগ পাই। এবার এশিয়াডে সোনা জিতলে হয়তো ভবিষ্যতে পেশাদার বক্সার হয়ে গিয়ে বিশ্ব বক্সিংয়ে সবকটি অনুমোদিত পেরেন্ট বডির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারি। বিজেন্দর সিংহের মতো পেশাদারি দুনিয়ায় ছাপ ফেলতে চাই। তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিরাট মাইনের চাকরি, পরিবার-পরিজন ভুলতেও রাজি শিবা। ■

অন্য রকম

দেশের প্রথম মহিলা দমকলকর্মী কলকাতার তানিয়া সান্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাঙালি ভিতু, বাঙালি কূপমণ্ডূক এবং বাঙালি কুটকচালিতে সিদ্ধহস্ত। এখনকার বাঙালিদের সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য শুনতে আমরা সবাই কমবেশি অভ্যস্থ। কিন্তু ভিতু বাঙালির বদনাম কিছুটা হলেও ঘুচিয়ে দিয়েছেন দমদমের তানিয়া সান্যাল। এমন একটি পেশা তিনি বেছে নিয়েছেন যা এতকাল পুরুষদের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল। তানিয়া দমকলকর্মীর পেশায় যোগ দিয়েছেন। যদিও তানিয়াকে সাধারণভাবে দমকলকর্মী বলা যাবে না। তিনি যোগ দিয়েছেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়াতে। অর্থাৎ বিমানবন্দরে কোনওরকম অগ্নিকাণ্ড হলে যারা সেই আগুন নেভাতে এগিয়ে যাবেন তাদের মধ্যে তানিয়া অন্যতম।

ব্যক্তিগত জীবনে তানিয়া বরাবরই ভয়ডরহীন। যারা তাঁকে ছোটবেলা থেকে চেনেন তারা জানেন মেয়ে হলেও তানিয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র মেয়েলিপনা নেই। তিনি ঠিক কেমন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তানিয়া বলেন, 'একবার কেমিস্ট্রি ক্লাসে সব মেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এর কারণ আমি বুঝতে পারিনি, পরে দেখলাম একটা আরশোলার জন্য এই অবস্থা। আমি আরশোলাটা ধরে জানলা দিয়ে ফেলে দিই। এই ঘটনার পর থেকে কলেজে আমার নাম হয়ে গিয়েছিল বীরাঙ্গনা।'

ঘটনাটা নেহাত সামান্য নয়। আরশোলার অস্তিত্ব টের পেলে খুব কম বাঙালি মেয়েই স্থির থাকতে পারেন। তানিয়ার দিদি তানিমাও বোনের সাহসিকতার কথা গর্বের সঙ্গে বলেন। যদিও তানিয়ার ছেলেবেলা ছিল আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই। এমনকী তাকে ঘিরে বাবা-মার প্রত্যাশাও ছিল মধ্যবিত্ত ঘরানার। ছোটবেলায় শাস্ত্রীয় নৃত্য শিখেছেন, ছবি আঁকা শিখেছেন। আগুন নেভানোর মতো লাগামছাড়া কাজের ইঙ্গিত সেই ছোটবেলায় ছিল না।

যেদিন খবরের কাগজে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো সেদিন তানিয়া তার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি সব সময়েই অন্যরকম কিছু করতে চেয়েছি। কিন্তু সুযোগ না আসা পর্যন্ত কী করব বুঝে উঠতে পারিনি। এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিলাম। তখন দুর্গাপুজো চলছে। পঞ্চমীর দিন একটা চিঠি পেলাম। আমি সিলেকটেড হয়েছি। ফিজিকাল ফিটনেস এবং মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ভুবনেশ্বর যেতে হবে। পুজো-টুজো কলকাতায় ফেলে দৌড়লাম ভুবনেশ্বরে'।

সব পরীক্ষাতেই তানিয়া ভালোভাবে পাশ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল মাত্র কুড়ি সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়। চল্লিশ কেজি পর্যন্ত ওজন তোলা এবং দড়ি বেয়ে উঁচু জায়গায় ওঠা। যারা তাকে পরীক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ বিস্মিত। কারণ এখানেও উঠে এসেছে নারীপুরুষ নির্বিশেষ বাঙালিদের মানসিকতা। সাধারণভাবে বাঙালিরা একটু নরমসরম প্রকৃতির হয়। শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর কাজে বাঙালিরা, বিশেষ করে কলকাতার বাঙালিরা ততটা দক্ষ নন। সেখানে দমদমের বাঙালি মেয়ে তানিয়া যে ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছে তা এককথায় অভূতপূর্ব।

আপাতত তানিয়ার ঠিকানা দিল্লি। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। যথেষ্ট উপভোগ করছেন তার জীবনের এই পর্বটিকে। তানিয়া বলেন, 'যেহেতু এই পেশায় আমিই প্রথম মহিলা তাই এখানকার সকলেই আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছেন। নিজেকে লাকি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।' এই পেশার ঝুঁকি সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল। তাঁর মতে যে গতিতে তাদের কাজ করতে হয় সেটাই এই পেশার সব থেকে বড়ো ঝুঁকি। তানিয়া বলেন, 'সময় এখানে খুবই কম। নব্বই সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু করতে হয়। বিমানে আগুন লাগলে সেই আগুন নেভাতে ২ মিনিট ১৮ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়। এর বেশি সময় নিলে আগুন বিমানের ফুয়েল ট্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়বে। বিস্ফোরণে উড়ে যাবে বিমানটি।' ▮

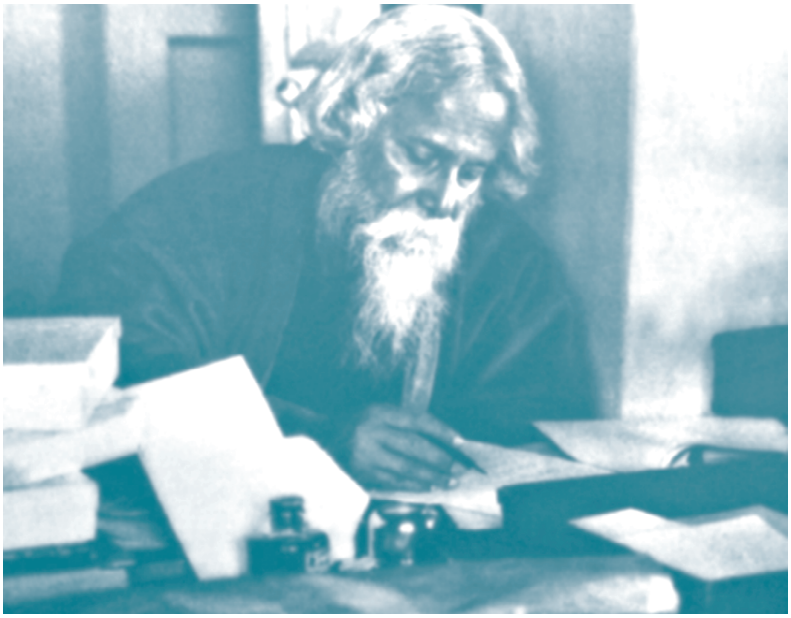

‘এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে’

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তথা ধর্মান্তর রোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং প্রসারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে যে ‘মানুষের ধর্মে’র কথা বলেন— তাও এক উদার হিন্দুধর্মেরই সারাৎসার। আমরা এই রচনায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করে এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জেনে নিতে পারি। ‘হিন্দুধর্ম’ বলতে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন— ‘হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদ-নদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাত পরস্পরের একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টান হইয়াছেন বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না”— (‘আত্মপরিচয়’, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৭৪-৭৫)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। তিনি অনুভব করেছিলেন অস্পৃশ্যতা জাতিভেদপ্রথা— নানা রকম কুসংস্কারে হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে জাতি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ‘অপমানিত’ কবিতায় তাই লিখেছিলেন :

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করলেও আমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করিনি। ফলে হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়েছে। বহু মানুষ অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর তার পরিণাম স্বরূপ ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন দেখেছেন হিন্দু সমাজের উপর কোনও আঘাত নেমে এসেছে তখন দৃঢ়ভাবে সত্য কথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করা হলে তিনি প্রতিবাদে গর্জে উঠে বলেছিলেন : “আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন ছিদ্র, কোন পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। —মুসলমান যখন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনও বা বাধা পায়নি— এক ঈশ্বরের নামে ‘আল্লাহো আকবর’ বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব ‘হিন্দু এসো’ তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী... কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। ...পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীর কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভাল হও, নরহত্যার উপরে কোনও ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পরের কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না।” (রবীন্দ্ররচনাবলী— বিশ্বভারতী, খণ্ড-১২, পৃ. ৬৫৭)

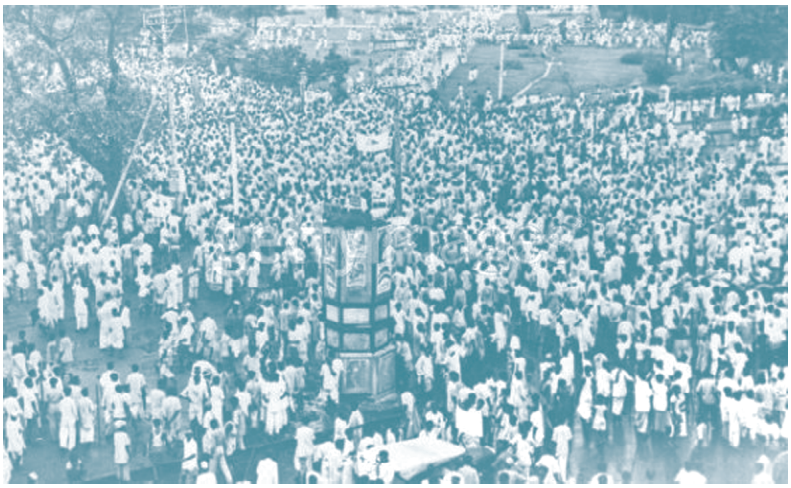

খিলাফত আন্দোলন।

কালিদাস নাগ একবার রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন--- ''এই পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনও উপায় নেই।'' (হিন্দু-মুসলমান, রবীন্দ্ররচনাবলী-বিশ্বভারতী, পৃ. ৬১৯)

যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আজীবন সক্রিয় ছিলেন, লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিরোধিতা করে পথে পথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে আন্দোলনের ফলে একদিন (১৯১১) কার্জন সাহেব বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথও দুঃখের সঙ্গে কালিদাস নাগকে উল্লিখিত কথাগুলি জানিয়েছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সত্যকে কখনও অস্বীকার করেননি।

১৯২৩ সালে মৃণালকান্তি বসুর সঙ্গে কথোপকথন কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— দেশের সর্বত্র সবচেয়ে প্রবলভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হলো হিন্দু মুসলমানের মিলন সমস্যা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল— এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প কেবল বিলাস স্বপ্নই থেকে যাবে। তখনকার অনেক নেতা মনে করতেন— বিদেশি প্রভুত্ব লোপ পেলে দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভবপর হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনও একথা বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন— ''ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ডেমোক্রেটিক মুসলমান কেন ধর্ম সম্পর্কীয় আভিজাত্যগর্বিত শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্বল।'' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন— তিনি মোপ্‌লা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন— চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকম অভিভূত।

তিনি আরও বুঝেছিলেন--- হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে আর একটি প্রধান ব্যাপার। তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। ধর্মের বন্ধনই এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ তখনকার মুসলমান নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে— ''আফগান বা অপর কোনো মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কিনা। জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি।''

শুধুমাত্র সমস্যার কথা উল্লেখ করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। হিন্দুসমাজকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি মনে করতেন তোষণ করে পাইয়ে দিয়ে কোনো সমাধান হয় না। ''এ সমস্যার সমাধান হবে না কেবলমাত্র হিন্দুর খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে।'' তিনি বিদ্রূপ করে এও বলেছিলেন— ''এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তা হলেই সম্ভব হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে।''

এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তিনি দুটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথমত হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই প্রসঙ্গে 'হিন্দু মহাসভা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। ''হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।'' হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা দেখে মুসলমানরা সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে--- ''মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেইনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামতো হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনও করছে আমরা তো কখনও বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?'' কিন্তু একথাও তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে— ''হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড়ো কঠিন— যেসব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়োই শক্ত। সামাজিক ভেদনীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।''

হিন্দুর মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে যেমন সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব, তেমনি মুসলমানের মনেও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— মুসলমানের মনে যদি দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে বিদেশি বহিঃশত্রু মুসলমান হলেও তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে লড়াই করতে পারে। ''মুসলমানের বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে এবং সে ডাকাত যদি মুসলমান হয়, তা হলেই কি সে মুসলমান ডাকাতের বিরুদ্ধে হাত তোলে না বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না?'' তেমনি একবার দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে ধর্মের টান অপেক্ষা 'দেশাত্মবোধই জয়লাভ করবে।'

(উল্লিখিত উক্তিগুলি রবীন্দ্ররচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চদশ খণ্ড পৃষ্ঠা-১১২২—১১২৬ থেকে গৃহীত।)

সামাজিক সমরসতার নিবিষ্ট সাধক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

অনীত রায় গুপ্ত

বাঙালির মনোজগতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান সকলের শীর্ষে। অগণিত নক্ষত্র জগতের মধ্যে তিনি ধ্রুবতারা। সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর ভাবনা-চিন্তা-কর্ম পরিকল্পনা। কাব্যসাধনা প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস সব কিছুর মধ্যেই তিনি সামাজিক সমরসতার চিন্তায় নিবিষ্ট থেকেছেন। বাঙালি হিন্দু সমাজের জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, এমনকী সরকারি উচ্চপদে আসীন থাকার অহংকার, ধনী দরিদ্রের নিষ্করুণ ভেদাভেদ তাঁকে দারুণভাবে আহত করে তুলেছিল। মর্মাহত কবি তাই অন্তরের আকুতিতেই লিখেছেন—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে—
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান।

সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়— যাঁকে তিনি 'যত্র ভবতি বিশ্ব একনীড়ম্' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে সকল শিক্ষার্থীকে এক সারিতে বসার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেখানে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ কোনও ভেদরেখা ছিল না। সকল শিক্ষার্থী একসুরে গলা মিলিয়ে আজও উচ্চারণ করে— মোদের শান্তিনিকেতন সে যে সব হতে আপন।

অন্তরের উদার ঐশ্বর্য্য আগুনের মতোই পবিত্র। সেখানে যত পাপ তাপ গ্লানি উদারতার আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনার মতোই উজ্জ্বল সমাজদেহ গঠন করে। তাই তো গীতাঞ্জলির পাতায় ফুটে ওঠে তাঁর অন্তরের কথা—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।

কবিগুরু ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। পরম পবিত্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তিনি একেবারে মাটির আসনে তাঁকে পেতে চেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই—

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।

এই গানের মধ্যেই যেন সামাজিক সমরসতার মর্মবাণীটি আমরা শুনতে পাই।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।

উদার, বিবেকবান, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই সকল মানুষ ও জীবের মধ্যে সমানভাবে ঈশ্বরের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারেন। ঋষি কবি এই পরমসত্য স্বরূপের সন্ধান পেয়েছেন বলেই এমন কথা তাঁর কবিতা ও গানের মাঝে আমরা খুঁজে পাই।

সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অন্ধ-আতুর, অনাথ অভাবগ্রস্তদের সকলের সঙ্গে একসারিতে আনার জন্য তাঁর কাব্য সাধনার সরোবরে ফুটে উঠেছে অমৃতময় বাণী— অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।

উপনিষদের ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথ আধুনক ভারত নির্মাণ কর্মে আজীবন ব্রতী ছিলেন। সকল মানুষই এক অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং কোনও মানুষই ছোট নয়। সকলকে নিয়েই আমাদের সমাজের অগ্রগমন সম্ভব হয়ে উঠবে। এই গভীর বিশ্বাস নিয়েই কবি রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

অস্পৃশ্যতা মানবতার চরমতম অপমান। জাতিকে সাবধান করার জন্যই কবির হৃদয়মথিত উচ্চারণ—

সেই নিম্নে নেমে এসো না হলে নাহি রে পরিত্রাণ।

কবিগুরুর কাব্য রচনা সমাজ গঠন ও সমাজ দর্শনের এক অভিন্ন সাধনা। তিনি উপলব্ধি করেছেন দীন-হীন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের মাঝেই নররূপী নারায়ণ আছেন। আমরা আভিজাত্য ও অহংকারের মিনারে বসে তাঁদের বিস্মৃত হয়েছি। কয়েক শতাব্দী ধরে বয়ে চলা এই কু-অভ্যাস জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল করে তুলেছে। তাই কবির সাবধান বাণী—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।

বিজ্ঞানের ভাষায় প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া থাকে। অনুরূপ ভাবে সমাজের অসহায় দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার কুফলও বৃহত্তর সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

সামাজিক সমরসতা বিষয়ে কবির অন্তিম দৃষ্টিভঙ্গি—

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও মানবতার অপমানে মুখর হয়েছেন। সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া আফ্রিকা মহাদেশের মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। সভ্যতার অহংকারী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা আফ্রিকার সহজ সরল মানুষগুলিকে ক্রীতদাস বানিয়ে অত্যাচার করা মানবতার অপমান। তাই আফ্রিকা কবিতায় কবির পরামর্শ—

দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

ঋষিকবির ভাবনা ও উদার দূরদর্শিতা আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কলকাতার একদল অভিজাত মানুষ সমাজের নিম্নশ্রেণীর দীন-দুঃখী অভাবগ্রস্ত মানুষদের উপকার করার নেশায় মেতে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ এই সকল শৌখিন সমাজসেবীদের চোখ আঙুল দিয়ে সমাজ মনস্তত্ত্ব 'লোকহিত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ''ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না। ছোট হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।" আরও বলেছেন— ''হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনও অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।" ইতিহাসের নিদারুণ সত্য কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুভূতি এবং দৃষ্টির মধ্যে ছিল। হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভারসাম্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— ''বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্রসমাজে এই শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।"

সমাজের সকল ক্ষেত্রেই সমরসতা দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে আমরা কবিগুরুর সমরসতা জ্ঞানের সন্ধান পাই।

''এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সামাজিক সমরসতার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বব্যাপী। বৃহত্তর ভারতবর্ষের সকল মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতজননী আবার বিশ্ববন্দিতা হয়ে উঠুক— এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর স্বপ্নের বৈভবশালী ভারত নির্মাণের কাজে সকলের প্রতি তাঁর উদার আহ্বান—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু-মুসলমান।
এসা এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে। ■

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

তৃণমূলের সাফল্যে 'উন্নয়নে'র হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ— এই তিন স্তরের মোট ৫৮ হাজার আসনের মধ্যে ২০ হাজার আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শতাংশের হিসাবে যা দাঁড়ায় ৩৪.২ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৪৮৬৫০ আসনের মধ্যে ১৬৮১৪, পঞ্চায়েত সমিতির ৯২১৭ আসনের মধ্যে ৩০৫৯ এবং জেলা পরিষদের ৮২৫ আসনের মধ্যে ২০৩টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা লড়াইয়ে জেতার ক্ষেত্রে যা রেকর্ড।

গ্রাম বাংলার এই নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার হারের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরের যে হিসেব পাওয়া গেছে তা এইরকম : *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইক্ষেত্রে বীরভূম জেলার ছবিটা নজরকাড়ার মতো। বীরভূম জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২২৪৭ আসনের মধ্যে ১৯৬৭ (৮৭.৫ শতাংশ) পঞ্চায়েত সমিতির ৪৬৫ আসনের মধ্যে ৪০৫টি (৮৭.১ শতাংশ) এবং জেলা পরিষদের মোট ৪২ আসনের মধ্যে ৪২টি আসনই জয়লাভ করেছে (১০০ শতাংশ)। ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য এজন্য বীরভূমে শাসকদলের নেতা অনুব্রত মণ্ডলের 'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে'-এর তত্ত্বকেই দায়ী করছেন।

সারণী	
বছর	বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসন জয় শতাংশের হিসেবে
১৯৭৮	০.৭৩
১৯৮৩	০.৭৪
১৯৮৮	৮.৯
১৯৯৩	২.৮১
১৯৯৮	১.৩৬
২০০৩	১১.০
২০০৮	৫.৫৭
২০১৩	১০.৬৬
২০১৮	৩৪.২০

রাজনৈতিক নেতা তৈরির পাঠ্যক্রম শুরু করছে আই আই ডি এল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবর্তনশীল চাহিদা ও সরবরাহের টানাপোড়েনে চাকরির দুনিয়ায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা আজ বহু বিভাগে ছড়িয়ে গেছে। যেমন, হোটেল, পর্যটন, ইভেন্ট থেকে শুরু করে ক্যাটারিং অবধি। কিন্তু সংস্থার দাবি অনুযায়ী এশিয়ায় এই সর্ব প্রথম রাজনৈতিক নেতা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণান্তে Diploma দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করল মুম্বই-য়ের India Institute of Democratic Leadership।

গত বছর থেকেই ৯ মাসের এই কোর্সে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে তৃণমূল স্তরে কাজ করার উপযুক্ত দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির জন্যই এই কোর্স। কোর্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল পেশাদার ব্যক্তিত্বরাই এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন। ক্লাসরুম ছাড়াও শিক্ষার অন্তর্গত ২টি ইনটার্নশিপ রয়েছে। প্রথমটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টিতে ১ মাস তারা রাজনীতিবিদ, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেবে।

বিভিন্ন সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌর প্রতিষ্ঠান, বিধানসভা এমনকী লোকসভাতে গিয়েও নেতাদের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করানোর ব্যবস্থাও এই কোর্সের অন্তর্গত। বর্তমানে এই কোর্সের অর্থমূল্য ৩ লক্ষ টাকা, তবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত প্রার্থী এলে তাদের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা জানালেন সংস্থার ডিন রবীন্দ্র সাঠে। একই সঙ্গে তিনি মুখ্য রামভাউ মহালগি প্রবোধনীর পরিচালকও। পাঠ্যক্রমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন সহকারী ডিন রবি পোখরানা। দেশের স্নাতকদের জন্য নির্দিষ্ট এই পাঠ্যক্রমে ৪০টি আসন আছে। এই বারেই আবেদনকারী ছিলেন ৪০০ জন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনীতি ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতার প্রত্যাশায় প্রশিক্ষিত ও আদর্শনিষ্ঠ নাগরিকদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিচ্ছেন সেই লক্ষ্যে আই আই ডি এল-এর এই প্রচেষ্টা সঠিক পদক্ষেপ। সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে সংস্থার আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই অভিনব প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহ ছিল নজরে পড়ার মতো। বিশদ জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে samparka@rmponweb.org.

এই প্রথম 'ডিফেক্স' প্রদর্শনীতে সামরিক সরঞ্জাম তৈরির দক্ষতা তুলে ধরল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম জেলার থিরুভিদান্তাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিবার্ষিক সামরিক সরঞ্জামের (ডেফএক্সপো-২০১৮) প্রদর্শনী। গত ১১ এপ্রিল শুরু হওয়া চারদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও। বলতে গেলে, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় এবারের প্রদর্শনীটি সবার নজর কেড়েছে। এই প্রদর্শনীতে সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ৫০০টি ভারতীয় সংস্থা এবং ১৫০টি বিদেশি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় ৪০টি দেশের প্রতিনিধিরাও এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র কথা বলেছেন, এই প্রদর্শনীতে তার সফল রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই প্রথম ভারতের সামরিক সরঞ্জাম তৈরির দক্ষতা তুলে ধরা হলো। এখন আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি, যেখানে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইরকম সময়ে 'মেক ফর ইন্ডিয়া' আর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র কৌশলগত ফারাক বোঝা আগের থেকে অনেক বেশি জরুরি।'

ডেফএক্সপো ২০১৮-তে সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেসব দেশের সঙ্গে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইজরায়েল। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, এই প্রদর্শনীর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, 'দেশের সাধারণ মানুষকে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং এই বিষয়টিতে তাদের উৎসাহী করা! প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সফল হয়েছে। চারদিনের এই প্রদর্শনীতে উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। অর্জুন ট্যাঙ্ক, ধ্রুব হেলিকপ্টার, যুদ্ধজাহাজ এবং বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে দেখেছেন দর্শকরা।

মেঘালয় থেকে প্রত্যাহৃত আফস্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীর্ঘ ২৭ বছর পর মেঘালয় থেকে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। একই সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের আটটি থানা এলাকা থেকেও আফস্পা প্রত্যাহার করা হলো। গত ৩১ মার্চ জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, গত দু দশক আগে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার তুলনায় এখন ৮৫ শতাংশ কম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আফস্পা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হচ্ছে।

দেশের যেসব উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, সেসব জায়গাতেই সেনাবাহিনীর হাতে আফস্পা জারি করে সেনাবাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রায় সাতাশ বছর আগে আফস্পা জারি করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশকে ঘাঁটি করে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (উলফা)-এর মতো জঙ্গি গোষ্ঠী তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করার ফলে এই দুই রাজ্যকেই ১৯৯১ সালে উপদ্রুত ঘোষণা করতে হয়। আর তখনই জারি করা হয় আফস্পা। এর আগে ২০১৫ সালে, ১৮ বছর জারি থাকার পর ত্রিপুরা থেকে আফস্পা প্রত্যাহৃত হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্র আরও জানাচ্ছে, ২০১৭-র ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি অসম সীমান্ত সংলগ্ন মেঘালয়ের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল উপদ্রুত হিসাবে ঘোষিত ছিল। ২০১৭-র ১ অক্টোবর এই এলাকা কমিয়ে ১০ কিলোমিটার করা হয়। এখন পরিস্থিতির আরও উন্নতি হওয়ায় মেঘালয় থেকে আফস্পা পুরোপুরি প্রত্যাহৃত হলো।

আসিফা কাণ্ডকে সামনে রেখে নোংরা খেলায় দেশদ্রোহীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি অশ্লীল চিত্রে ইতিমধ্যেই ছেয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। পুরুষের গোপনাঙ্গের স্থানে আঁকা হয়েছে ভারতবর্ষের মানচিত্র। তার রঙ টকটকে লাল। বড় বড় অক্ষরে লেখা 'জাস্টিস ফর আসিফা'। এই চিত্রটি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে কাশ্মীরের অষ্টম বর্ষীয়া এক মুসলমান বালিকার ওপর নারকীয় বলাৎকারের প্রতিবাদে উথলে ওঠা দরদের চিত্র এটি নয়। এক নিরীহ, নিরপরাধিনী, নিষ্পাপ বালিকার অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার সাম্প্রদায়িক পরিচয়টিকে হাতিয়ার করে পুনরায় দেশে অশান্তি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর পুরোন কৌশল এটি। আসিফার ঘটনাকে রঙ চড়িয়ে প্রচার করার পেছনে ভারত-বিরোধীদের আন্তর্জাতিক মদত দেখছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বহুদিন বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতায় প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য বলছেন, বর্তমানে বিশ্বের মুক্ত অর্থনীতির যুগেও ভারত অন্তত একটি ক্ষেত্রে অপরাধজনিত অর্থনৈতিক বাজারকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে। যেমন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিপণনের কোনও স্থান নেই। তাই ভারতে যৌন-পণ্যের অর্থনৈতিক চাহিদা তুলনায় বেশ কম। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যৌন কেলেঙ্কারির মারাত্মক সব অভিযোগ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কত মহিলা যে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছে সেটা গুনে শেষ করা যাবে না। ইটালির প্রধানমন্ত্রী বার্লুস্কোনির বিরুদ্ধে বহু কিশোরীকে যৌন অত্যাচারের অভিযোগের কথাও গোটা বিশ্ব জানে।

ইউরোপ-আমেরিকার খ্যাতিমানদের যেমন হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক, পরিচালক হার্ভে ওয়াইস্টাইন, টিভির পর্দায় জনপ্রিয় সঞ্চালক ম্যাট লওয়ার, সাংবাদিক মার্ক হালপেরিন, চার্লি রোস এদের বিরুদ্ধে নারী-নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ জলভাত হয়ে গিয়েছে। রাম রহিম বা আসারামের উদাহরণ যারা কথায় কথায় টানে তাদের এগুলি মাথায় রাখা উচিত বলে

শ্রী আচার্য মনে করেন। নৃপেনবাবু মনে করেন, ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি। সবদেশেই তা রয়েছে। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষকে 'ধর্ষণের রাজধানী' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা আসলে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর।

তিনি মনে করিয়ে দেন যে এদেশের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র একজন আদ্যন্ত সৎ ব্যক্তিই নন, তিনি সন্ন্যাসীর মতোই জীবন-যাপন করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন, ভারত যে একটি আধ্যাত্মিক দেশ একথা পৃথিবীবাসী জানে। তার পরিচয়কে কালিমালিপ্ত করতে কমিউনিস্ট এবং বৈদেশিক শক্তি বরাবরই সচেষ্ট হয়েছে। এখন নারীভোগ্য পণ্যের বাজার হিসেবে ভারতকে তারা গড়ে তুলতে চাইছে বলে তিনি মনে করেন। তাই একদিকে ধর্ষণকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ভারতকে অপবাদ, অন্যদিকে ভারতের বাজারে যৌন-পণ্যের আমদানি এই দুই লক্ষ্যে দেশদ্রোহীরা আসিফা কাণ্ডকে ব্যবহার করছে।

নৃপেনবাবু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যৌন অপরাধ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এর জন্য দায়ী প্রথমত, জনস্ফীতি, দ্বিতীয়ত, ফ্যাশন ইন্ড্রাস্ট্রির নামে যুবসমাজকে বিপথে চালিত করা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন প্রথম এনডিএ জমানায় যৌন উত্তেজনাকর প্রচারের নিয়ন্ত্রণে যে আইন আনা হয়েছিল, তাতে যৌন ব্যবসায়ীরা বিপদে পড়েন। এছাড়া ইন্টারনেট, কো-এড স্কুল, পানশালার অনুমতি ইত্যাদির ক্ষতিকারক দিকের প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন মনে করেন যে এই সামাজিক ব্যাধির মোকাবিলা সমাজের মাধ্যমেই করতে হবে, রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করা যাবে না। তাঁর মতে বিশ্বের পর্ন সাইট নিষিদ্ধ, সিনেমায় যৌন উত্তেজনাকর দৃশ্য সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই ধর্ষণের নিরাময়ের অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিবিসি ওয়ার্ল্ড থেকে বিশ্বের প্রচারমাধ্যম ধর্ষণ নিয়ে যে প্রচার করছে তার উদ্দেশ্য প্ররোচনামূলক এবং ভারতের উন্নয়নশীলতাকে বিশ্বের দরবারে অপদস্থ করবার চেষ্টা বলেই তিনি মনে করেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

৭ মে (সোমবার) থেকে ১৩ মে (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বৃষে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে কেতু, মীনে বুধ। বৃহস্পতিবার ৩-২০ মিনিটে বুধের মেষে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে শ্রাবণা নক্ষত্র থেকে মীনে বেরতী নক্ষত্রে।

মেষ : পিতার সার্বিক শুভ। প্রমোটার, খেলোয়াড়, শল্য চিকিৎসকদের নবোদ্যম ও সাফল্য। বিলাসিতায় আনন্দ ও ব্যয়। কর্মে সাফল্য ও প্রাপ্তি। পোশাক, বাহন ও বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। দৈব-দুর্ঘটনা ও কথাবার্তায় সতর্ক থাকা দরকার। অতিথি আপ্যায়ন, প্রিয়বাক্যে মনজয়। শিক্ষক-সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সম্মান প্রাপ্তি।

বৃষ : কর্মজনিত যশ-দেবভক্তি-গোপনীয়তা ও কৌশলী মন। অগ্রজের উন্নতি। খনিজ ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় শুভ। শরীরের যত্ন নিন। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। সন্তানের ভ্রমণ। বিনিয়োগ, পুরাতন ঝামেলায় কলুষিত মন। সহদরের শুভ। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় সংযুক্তদের খ্যাতি ও শংসা।

মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি। সৃজনশীল কাজে দক্ষতা, গৃহে আত্মীয় সমাগম, প্রেমিক-প্রেমিকার শুভ দিন। নিকটজন/প্রতিবেশী থেকে মানসিক আঘাত-উত্তেজনা এড়িয়ে চলুন। সার্বিক বিচারে হতাশাজনক তবে যুবক বন্ধু হিতকারী। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টির প্রকাশ, যুক্তিসঙ্গত কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া।

কর্কট : সফল উদ্যোগ, শত্রুজয়, কর্মে সাফল্য। শৌখিন রুচিসম্মত আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক ও খাদ্যগ্রহণ, মানসিক প্রশান্তি। পরিবার পরিজন সহ ভ্রমণ, উপার্জনের সার্থক প্রচেষ্টা। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী— গৃহে শুভ অনুষ্ঠান। প্রিয়জনের সান্নিধ্য, বিদ্যার্থীর শুভ। মানসিক চঞ্চলতা, আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন।

সিংহ : ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিতবাহী কর্মসংক্রান্ত শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ তবে ছলনাময়ীর কারণে সম্মানহানি। মায়ের শরীরের যত্ন নিন। বিদ্যুৎ ও অগ্নিভয়। কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় জয়ী। গৃহের সরঞ্জাম বৃদ্ধি, জীবনসঙ্গীর অদূরদর্শিতায় ব্যথিত হওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা : নতুন উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ। অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্য ও গৃহসুখ। বয়স্কদের বিরাগভাজন, ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিহত করুন। সহোদর বা প্রতিবেশীর ক্ষেত্র শুভ নয়, ভ্রমণ। পরোপকারী ব্যক্তিত্বের জন্য সাধুবাদ, সৃজনশীলতার প্রকাশ।

তুলা : জমি, বাড়ি অথবা নতুন কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ। নিজের পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক। বয়স্কদের রোগের উপশম। শরীরের কারণে অগ্রগতি ব্যাহত। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা। ফাটকা, শেয়ারে প্রাপ্তি হলেও স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। দেব-দ্বিজে ভক্তি। উচ্চ শিক্ষায় দূরগমন। উদাসীনতায় শুভযোগ হাতছাড়া। গৃহের মেরামতি ও মাতুলের সাক্ষাৎ।

বৃশ্চিক : গবেষণা, উচ্চশিক্ষা, সরকারি সম্মান, পত্নীর পদোন্নতি। নিম্নাঙ্গের চোট ও আঘাত থেকে সতর্ক। গৃহ সংস্কার, প্রণয়ের পূর্ণতা। শরীরের যত্ন নিন, বিদ্যার্থীর সার্বিক শুভ। কথাবার্তায় শত্রুতা হ্রাস, শরীরের মধ্যাংশের অস্ত্রোপচার যোগ। পরিবহণ ও খনিজ ব্যবসায় সাফল্য। অত্যধিক উচ্চাভিলাষ ও ছলনাময়ীর কারণে ভাগ্যবিড়ম্বনা।

ধনু : স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। কর্ম ও ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে বদলি— নারী সংক্রান্ত উদ্বেগ। গুরুজনের চিকিৎসা-আইনঘটিত বিষয় এড়িয়ে চলুন। জমি-জমা-গৃহ-ধনদৌলত বৃদ্ধি। সুপ্রসন্ন ভাগ্য। আয়ের ক্ষেত্র শুভ হলেও মিত্রস্থান হিতকারী নহে।

মকর : মিত্র ও প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে আনন্দ। ইলেকট্রনিক্স-ফোটোগ্রাফি-প্যাথলজি শিক্ষার্থীর শুভ। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকলেও উৎসাহজনক সংবাদ প্রাপ্তি। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ। আই টি সেক্টর-লেখক-আই-বি অফিসারদের বিশেষ শুভ যোগ। প্রণয়ের পূর্ণতা। শৌখিন ও বিলাসদ্রব্য ক্রয় ও ভোজন।

কুম্ভ : আত্মীয়-প্রতিবেশী-সহোদরের সম্পর্কের উন্নতি। গণিত ও ইলেকট্রনিক্স শিক্ষার্থীর শুভ। বিলাস ব্যসন ও রসনা তৃপ্তিতে ব্যয় ও আনন্দ। কর্ম পরিবর্তন। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। শুভ সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

মীন : আত্মীয় পরিজনের মেলবন্ধনে তীর্থ ভ্রমণ। ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর কারণে মনঃকষ্ট, সাংসারিক ছন্দপতন। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস, সামাজিকতায় দায়বৃদ্ধি। পরোপকার। দালালি, উকিল, প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাফল্য ও প্রশস্তি। দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ, অন্যথায় শত্রুতা যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য